ব্যারামবিলাস ও অন্যান্য গল্পকথা

ব্যারামবিলাস ও অন্যান্য গল্পকথা

সুধীর সরকার
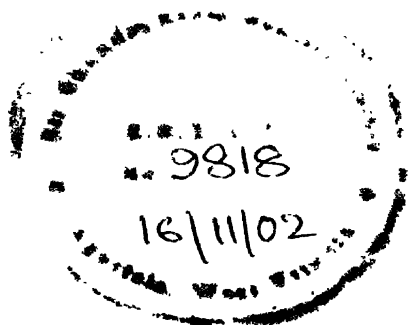
নিউ ত্রিপুরা বুক এজেন্সী
লেনিন সরণী, আগরতলা-৭৯৯০০১

ব্যারামবিলাস ও অন্যান্য গল্পকথা

Byarambilas O Anyanya Galpokatha
(A collection of Bengali balletic stories
by – Sudhir Sarkar)

প্রথম প্রকাশ — আগরতলা বইমেলা, ২০০২
প্রকাশক — বিপ্লব বনিক, নিউ ত্রিপুরা বুক এজেন্সী, আগরতলা
অক্ষর বিন্যাস — উৎপল সাহা, নিউ ক্যুয়িক প্রিন্ট, আগরতলা
মুদ্রাকর — অসিত সাউ, অনিল লিথোগ্রাফী ং কোং, ১৩, শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ — অমৃত দেবনাথ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার — জয়ন্তী সরকার

উৎসর্গ

বসিকপ্রবব, পবমপুরুষ
শ্রীশ্রী বামকৃষ্ণ পবমহংসদেবেব বাতুল চবণে
ভক্তিহীন আমাব যাষ্ঠাঙ্গ প্রণিপাত

পুরোধান

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিধৃত রচনাগুলো রম্য-সাহিত্য পরিচিতির স্পর্ধা করে না। দু'মলাটের বই হয়ে এগুলো পাঠকের হাতে পৌঁছুবে এমন দুরাশা করে এগুলো লেখা হয়নি। একটি সাহিত্যধর্মী পত্রিকা, আমার দ্বিতীয় গৃহ, কর্মস্থল, **'ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড'**এর মানস-কন্যা, পারিবারিক মুখপত্র প্রিয়দর্শিনী **'দূরসঞ্চারিকা'**র কথা ভেবে প্রথম লেখা হয়েছিল। পরিস্থিতির চাপে এই বালখিল্য রচনাগুলো যা শুধু পাণ্ডুলিপির আকারেই ধ্বংস হবার প্রতীক্ষায় ছিল, পুস্তকাকারে প্রকাশ করার মানস করেছি।

নেহাত গল্পের জন্যই গল্প বলা আমার কাম্য নয়; গল্পের আড়ালে নীতিকথাও নয়। ভাবনা আর কিছু কথার টানা-পোড়েন, কথায় নক্সীকাঁথার কাজ খুঁজে বার করাই আমার উদ্দেশ্য থাকে। নীরস তত্ত্বকথা নয়, অম্ল-কষায় রসের জারকে গল্প-কথাকে জাড়িত করে পাঠকের পাতে পরিবেশন করা খুবই কঠিন কাজ। আমি সাহিত্যিক নই। একথা জেনেই অস্তু আমার এই অভিযান। দু'একটি পংক্তিও যদি হঠাৎ কারো ভালো লেগে যায় এটা হবে আমার কাছে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো পরিতৃপ্তিকর।

বইটিকে মুদ্রণ প্রমাদ মুক্ত করে, তণ্বী-শ্যামা সুবেশা তরুণীর সাজে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার একটা ঐকান্তিক বাসনা আমার গোড়াতেই ছিল। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। এই চালাকিটুকু করে, প্রসাধনের আড়াল সৃষ্টি করে, কুরূপা অনূঢ়া কন্যা সৎ-পাত্রস্থ করার অপপ্রয়াস ও ধৃষ্টতার জন্য সুধী পাঠকের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ইতি—

বিনীত

সুধীর সরকার

সূচীপত্র

শ্যালক ও শ্যালিকা-বিষয়ক
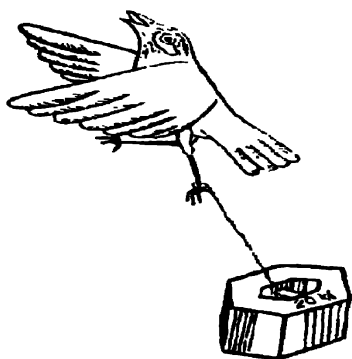
শ্যালক ও শ্যালিকা-বিষয়ক

নান্দীমুখঃ পরমপুরুষ, যুগাবতার, রসিকপ্রবর, পতিতপাবন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রণতি জানাই।

ধরতাইঃ শালা-তত্ত্বের উৎস সন্ধানে ঋগ্বেদের আঙিনায় স্থূল হস্তীর মত্ততা। 'শালা' তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার লোকপ্রিয়তার ঐতিহাসিক অথবা ধর্মীয়-আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট কী?

শ্যালক ও শ্যালিকা-বিষয়ক

সতর্কীকরণ

ঈশ্বরের স্বঘোষিত প্রতিনিধিরা!
অনুগামী শিষ্যের প্রণামীতে যাঁহারা
নূতন মডেলের মারুতি চড়েন, দেহবতী শিষ্যা ও ধনবান
শিষ্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন অথচ 'শালা'র মতো সামান্য
সাত্ত্বিক-মুখ-খারাপ বচন সহ্য করিতে পারেন না,
তাঁহারা বা তাঁহাদের শিষ্য-সামন্তরা
'শ্যালক ও শ্যালিকা-বিষয়ক' রচনাটি পড়িবেন না।

পর্ব-১

শ্যালক-সমাচার

'শ্যালক ও শ্যালিকা বিষয়ক' এই রচনাটি একটি গল্প-নির্ভর লঘু রম্য-নিবন্ধ। এমন একটি চটকদার লঘু নিবন্ধের মুখবন্ধ রচনায় পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করা কি খুব গর্হিত কর্ম হচ্ছে না? ধর্মের ধ্বজাধারী হিন্দুধর্মের 'লাদেন-ওমর-আয়াতুল্লা-মোল্লা'রা না জানি আবার কী বলেন? কোন্ ফতোয়া জারি করেন! ঠাকুর! কোন কেলেঙ্কারি হবে না তো?

পাপিষ্ঠ অর্বাচীন আমি, আমারতো মনে হয়, দুষ্কর্মও যদি ঈশ্বরের নামে শুরু করা যায় তাতে সিদ্ধিলাভ তরান্বিত হয়। জ্ঞানীরা কী বলেন? শালা, সর্বনেশে কথা বলছি না তো? ঠাকুর কথায় কথায় বলতেন 'ধুর্ শালা'। তাঁর উচ্চারিত 'শালা' শব্দে যুগপৎ প্রকাশ পেত প্রশ্রয়, স্নেহ, তিরস্কার আর তাঁর স্বভাব-সুলভ অকৃত্রিম ভালোবাসা। শ্রীম-প্রসাদাৎ আমার কেন জানি এমনই বদ্ধমূল ধারণা। টিকিবিহীন আধুনিক পণ্ডিতরা কী বলেন জানি না।

জনৈক বিপথগামী, ভ্রষ্ট অথচ ভক্ত ব্যক্তির আনা সন্দেশে ঠাকুর পাপের গন্ধ পেতেন; বলতেন— 'এ কোন্ শালার সন্দেশ র‍্যা? শালা রাঁড়বাড়িও যায়, আমার এখানেও আসে।' ঈশ্বর, ঈশ্বরের অনুগামী বা কোন অবতার কথিত কোন

ধর্মগ্রন্থে আমি এমন নজীর খুঁজে পাইনি, যেখানে ভক্তের নিবেদিত নৈবেদ্য হাতে ছুঁয়ে দেবতা অম্লান বদনে বলতে পারেন— 'এ কোন্ শালার নিবেদিত নৈবেদ্য রে?' শালা ও সন্দেশ আমাকে পুলকিত শিহরিত করে। ঠাকুরের মধুর কথামৃত, অমৃত বচন, ভক্তিহীন, পাষণ্ড আমাকে স্পর্শ করে না। আমি তাঁর 'ধুর্ শালা'কে নিয়ে রস খুঁজে মরি। করুণাময় ঠাকুরও আমাকে বঞ্চিত করেন না। তাঁর করুণায় আমার শালাতত্ত্ব, শালা-সমাচার, শালার সাতকাহণ আড়ে-বহরে বাড়ে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় পাঠকদের শালার সন্দেশ (এখানে সন্দেশ সমাচার অর্থে) শোনাব। শালা' কোন অর্বাচীন বা সামান্য ব্যক্তি নন। 'শালা হইতে সাবধান'। শালার আর্থ-সামাজিক বেক্গ্রাউণ্ড অবহেলা করার নয়। আমার মনে হয়, 'আমজনতা'র মধ্যে 'শালা' বিশেষ প্রজাতির 'বেগমখুশ' বাদশাভোগ্য রসাল ফল। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির সূতিকাগার বেদের পৃষ্ঠায় শালার উল্লেখ স্বর্ণাক্ষরে এন্‌গ্রেভ্‌ড্। দেশ ভেদে 'শালা'র ভিন্নতর নাম; মূল উৎস দেবভাষাই। বুৎপত্তি নির্ণয় করলে, শালাই বলুন, রাষ্ট্রভাষায় 'সালে'ই বলুন বা আমাদের আঞ্চলিক 'হালা'ই বলুন উৎসে আছে সেই দেবভাষা সংস্কৃত। তাই শালা-তত্ত্বের উৎস সন্ধানে; মত্ত হস্তি আমার সঙ্গে আসুন, পরিক্রমা করে আসি ঋগ্বেদের সুরম্য আঙ্গিনা।

'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ' নয়— একই স্টাইলে প্রশ্ন করুন 'শালা'কে। জিজ্ঞেস করুন— 'শালা তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' দেখুন শালা হাসিমুখে জবাব দেবেন— 'ঋগ্বেদের আঙ্গিনা হইতে; ধৃতিমান, প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান বৈদিক ঋষির কণ্ঠ হইতে।' শালার উৎস সন্ধানে লিভিংস্টোনের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম পুঁথি-পুস্তকের জঙ্গলে। মুর্খ আমাকে 'শালা'র হদিস দিলেন গ্রন্থাগারের সর্বোচ্চ তাকে সংরক্ষিত শাশ্বত ঋগ্বেদ।

ঘরে ঘরে লালিত, এ যুগের একটি কুটির-শিল্প, কন্যাদান ও কন্যাপণ নিয়ে একটি মুখরোচক নিবন্ধ লিখে ভাবছিলাম সমসাময়িক সমস্যার নেপথ্য-নায়ক নায়িকা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শাশুড়ি, ননদ, ভাজ, দেবর আর মৌনমুখো বর ও বরের বর্বর পিতা তথা কলাকুশলী ও শিল্পীদের একটু আনন্দ দেব; একটু উস্কে

দেব এবং 'দৈনিক সংবাদ'এর পাতায় ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করব। ভেবেছিলাম ভারী ও গুরুগম্ভীর গেরামভারী একটি পণ্ডিতভক্ষ্য জাঁদরেল প্রবন্ধ লিখে তাক লাগিয়ে দেব। তাই বেদ উপনিষদ ঘেঁটে মরছিলম।

কিন্তু আমার সে গুড়ে বালি। কন্যাপণ আর বধু-নির্যাতনের মতো বহু-আলোচিত সনাতন বিষয় ছেড়ে 'শালা'কে নিয়ে পড়লাম। এ যেন চাইছিলাম তৃষ্ণায় জল, পেলাম তিনটি বেল। তাই বা বলব কেন— সে যেন রাই কুড়োতে বেল। কন্যাপণের তথ্যের সাথে বাড়তি পেলাম শালা-সমাচার।

দেখলাম আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পাথুরে প্রমাণ রেখে গেছে 'শালা'র গুণগরিমা আর বদান্যতার। শাশ্বত সাহিত্য সাক্ষ্য বহন করছে একদা আজকের এই গোবেচারা ভালোমানুষ 'শালা'র হাত কত লম্বা ছিল। শালাদের কল্যাণ হস্তের পরশ পেয়ে কত কত রাজা-বাদশা-ঋষি-পণ্ডিত-রামা কৈবর্ত যুগে যুগে ধন্য হয়েছেন। আমার কৃতজ্ঞতা বেদের তিন ভাষ্যকার মুদ্‌গল, বেঙ্কট ও সায়ণ, এই তিন প্রাতঃস্মরণীয়ের কাছে। মুদ্‌গলের ভাষ্য অনুসারে—

"স্যাং শূর্পং তস্মাৎ যো লাজানাবপতি স স্যালঃ
স ভগিনীপ্রীত্যর্থং বহুতরং প্রযচ্ছতি।"

অস্য বিগলিতার্থ, একটু বিশদ করে বলি। স্যাং বা শূর্প মানে হল কুলো— আমাদের অতি পরিচিত শস্য ঝাড়ার কুলা বা কুলো। আর 'লাজ' শব্দের অর্থ এখানে লজ্জা নয়। 'লাজ' মানে 'খৈ'— হ্যাঁ সেই উড়কি ধানের মুড়কি আর বিন্নি ধানের খৈ অথবা 'বিন্নীর খৈ লাল-বাতাসা'। হিন্দুসমাজে বিবাহ ও অন্যান্য মাঙ্গলীক অনুষ্ঠানে এই সুপ্রাচীন কুলো ও খৈ অবিচ্ছেদ্য উপকরণ। কেন জানে হয়ত মহেঞ্জোদরোর আমল থেকে এগুলো আমাদের নিত্যসঙ্গী। 'আবাপন' মানে বিবাহ মণ্ডপে বর ও বধূ। মোদ্দা কথা— বিবাহ মণ্ডপে, বিবাহকালে, বর ও বধূর হাতে যিনি কুলোয় করে 'লাজ' বা খৈ তুলে দেন তিনিই 'স্যালঃ' বা শ্যালক অথবা আমাদের চিরপরিচিত আদরের শালা।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, স্যলঃ বা শালা শুধু 'লাজ' বা খৈ কুলোয় করে বরবধূর হাতে তুলে দিতেন না। এই কুলোতে খৈয়ের সঙ্গেই থাকতো মালকড়ি, নগদ-নারায়ণ, সোনাদানা। তবেই কন্যা সালঙ্কারা। শ্লোকটিতে শালাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে; ভগিনীপ্রীত্যর্থং ভগিনীকে (না কি ভগিনীপতিকে) বহুতর ধনের দাতা বলা হয়েছে দানবীর শালাকে। যথেষ্ট উপঢৌকন দিয়ে তোষামোদ করে কন্যাদানের সেই শুরু অনন্তকাল আগেই। অযথা আজকালের হৃদয়হীন জামাতা বাবাজীদের দোষারোপ করে কী লাভ?

অনধিকার চর্চা ও দুঃসাহস যখন করলামই আসুন আমরা দেখি শ্যালক বা শালা সম্বন্ধে সর্বশক্তিমান স্বয়ং শ্রীহরি ঈশ্বর কী বলেন? ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা কী? অবশ্য এ সিদ্ধান্ত আমাদের নিজস্ব, একান্তই মনগড়া। এ তথ্য ঈশ্বরের স্বঘোষিত প্রতিনিধি, তাঁর প্রচার-সচিব, প্রচার দপ্তরের ইজারাদার শাস্ত্রকারদের মারফৎ সংগৃহীত নয়। সে যাই হোক, আমার মনে হয়, জনান্তিকে হয়ত শ্রীহরি এ কথাই বলতে চেয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাও খুব একটা সুখদায়ক নয়।

তিস্রো ভার্যাস্ত্রি শালাশ্চ ত্রয়ো ভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ ।
ধ্রুবং বেদবিরুদ্ধাশ্চ ন হ্যেতি মঙ্গলপ্রদাঃ ।।

অনুস্বর ও বিসর্গ-বহুল দেবভাষায় আমার জ্ঞান 'অদ্য ভক্ষয়ামি ধনুর্গুণং' পর্যন্ত। শালা-লাঞ্ছিত এই একটি শ্লোক, এটি নাকি ভগবান শ্রীহরির শ্রীমুখ-নিসৃত অমৃত বাণী; পেয়েছিলাম এক স্থানে, ভিন্ন প্রসঙ্গে। এখানে 'শালা' শব্দের অপব্যাখ্যা করে, কদর্থ করে নিজের মবারি জাহির করার অবকাশ আছে। কিন্তু ব্যারামবিলাস ও অন্যান্য গল্পকথার পাঠককে এতো বোকা মনে করা উচিত হবে না। এই শ্লোকটিতে 'শালা'র উল্লেখ আছে তবে তা ভিন্ন অর্থে। আমার মতো 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী'দের রজ্জুতে সর্প ভ্রম হতে পারে! এ শালা আদৌ সে 'শালা' বা শ্যালক নয়।

শালা'র তথ্য আহরণে তৎপর, অর্বাচীন আমি ভেবেছিলাম এই 'শালা' বুঝি সেই চিরন্তন 'স্যালঃ' বা শালাই। কিন্তু আমার সে গুড়ে বালি। শ্লোকটিতে

অপয়া তিনের নিন্দে করা হয়েছে; বলা হয়েছে— তিনটি ভার্যা বা স্ত্রী, তিনটি শালা, তিনটি ভৃত্য বা চাকর, তিনজন বান্ধব সবই অনর্থের হেতু। কোনটাই তিনটি থাকা মঙ্গলপ্রদ নয়। এটি নাকি স্বয়ং ঈশ্বরের কথা।

পণ্ডিতেরা এখানে 'শালা'র অর্থ করেছেন, আলয়, কুটীর, বাড়ি, গৃহ বা প্রাসাদ যাই বলুন, সেই আদি অকৃত্রিম বাড়ি। যেমন পর্ণশালা, পানশালা, গোশালা, পাঠশালা ইত্যাকার যাবতীয় শালা। আমার মনে হয়, এখানে যেহেতু 'স্ত্রী'র পরেই অমঙ্গলপ্রদ তিন 'শালা'র কথা আসছে, এই শালা বোধ হয় সেই স্ত্রীর ভ্রাতাই। পরোক্ষে ভগবান শ্রীহরি হয়ত তেমনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন কি না কে জানে! একাধিক বা তিনটি শালা থাকাও অমার মতে মঙ্গলপ্রদ নয়। শালাদের আব্দারের কী কোন সীমা-পরিসীমা আছে!! গৃহিণীর ভ্রাতা বলে কথা! আসুন, এ সম্পর্কে একটা অতি পুরনো অথচ বার বার শোনা যায় এমন গল্প শুনি —

শালাদের অন্যায় আব্দারের একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন রেখে গেছেন কৌতুক অভিনেতা সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কৌতুক নক্সায়। সাম্যময়কে চিনলেন না? তিনিই কৌতুক-কৌতুহলের প্রতিমূর্তি প্রবাদ-প্রতিম প্রয়াত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাচন ভঙ্গীতে শালাদের লাগামছাড়া আব্দারের মজাদার গল্প শুনিয়েছেন। কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হলেও এটি একটি উৎকৃষ্ট গল্প। শালাদের সহোদরা, আধুনিকা ও নবীনা যাঁরা গল্পটি জানেন না জেনে পুলকিত হবেন। প্রাচীনা ও প্রৌঢ়া যাঁরা জানতেন ভুলে গেছেন, আবার মনে পড়বে।

বয়ঃসন্ধির চাপল্য বশতঃ সাইকেলের আগে পিছে সোয়ারী নিয়ে রাস্তায় ভ্রমণ করতে গিয়ে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ঢাকার ভানু পুলিশের হাতে পড়েন; অর্থাৎ পাঁচ-আইনের মামলায় (পেটি কেস্) পড়ে আদালতের কাঠগড়ায় উঠেন। হাকীম যথারীতি তাঁকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করে বলেন— 'তোমার বাবাকে খবর দাও। বাবা এলেই ছেড়ে দেব।' শুনে ভানুর মাথায় হাত। বাবাতো নেই; বাবা মরে গেছেন সেই কবে! এবার বুঝি ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হয়! এখন উপায়?

শুধু বাপের অভাবে আইনের বেড়াজালে জড়িয়ে জেলে যেতে হবে! বাপ থাকলে ভাবনা ছিল না। ভানুর এই চরম দুরবস্থায় আদালতের কোনায় দাঁড়িয়ে তাঁর ভগ্নীপতি দাঁত বার করে হাসছেন দেখে ঝটিতি ভানুর ঢাকাই-বুদ্ধির আগল খুলে যায়। হাকীমকে বলেন— 'হুজুর! ঐ যে কোনায় খাড়াইয়া দাঁত বাইর কইর‍্যা হাসতাছে তাইনেই আমার বাপ।' হাকীম নকল বাপকেই আরো একদফা তিরস্কার করে ভানুকে মুক্তি দেন।

কোর্ট চত্বরের বাইরে এসে লজ্জিত-ক্ষুব্ধ-বিমর্ষ-বিপর্যস্ত ভগ্নীপতির জিজ্ঞাসা— 'হায়! হায়! ভানু, শেষ পর্যন্ত তুই আমারে বাপ বানাইয়া ছাড়লি?' ভানুর চাঁছাছোলা জবাব— 'এতো ট্যাহা পইসা খরচ কইর‍্যা বইন বিয়া দিছি! হালায়, প্রয়োজনে তুমি বাপ অইতে পারবা না?' শালার কতো আব্দার যে ভগ্নীপতিদের সইতে হয়!!

আমরা পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে আসি; অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী ও শ্যালক-প্রসঙ্গে কথা বলি। একাধিক শালা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়; পরিবার কল্যাণের যুগে এ কথাটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হরিবংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র স্ত্রীর উল্লেখ আছে। কিন্তু ভগবানের কত সহস্র শ্যালক ছিলেন সে সম্পর্কে খুব পরিষ্কার করে কিছু বলা আছে কী? পণ্ডিতেরা গবেষণা করে দেখতে পারেন। এমন একটি লোভনীয় বিষয় থিসিস্ ও ডক্টরেট -লোভীদের আকর্ষণ করতে পারে।

আসল কথা, তিনটি স্ত্রী থাকলে দাম্পত্য কলহ বাড়বে বই কমবে না। মহাজনের কাছ চড়া সুদে ঋণ নিয়ে তিনটি বাড়ি করতেই হবে। ঋণ শোধ করতে পাগল-পাগল দশা হবে। উটকো ঝামেলা, এ স্থলে খোদার খাসী তিনটি শ্যালকও থাকতেই পারে। গোদের উপর বিষফোঁড়া, তিন স্ত্রীর জন্য তিনটি চাকর রাখতেই হতে পারে। স্ত্রীরা যদি আবার রূপসী হন তো সমূহ সর্বনাশ; বন্ধু তিনটিও চিন্তার কারণ হতে পারে। অশান্তি গোকুলে বাড়বে। অতএব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা বুঝতে কষ্ট হয় না সমস্ত ঝামেলার মূলে Frailty, thy name is woman.

এক স্ত্রীই সামাল দেয়া যায় না! তার পর কিনা, তিন বাড়ি, তিন শালা, তিন চাকর আরো যত অনাসৃষ্টি অবাঞ্ছিত উৎপাত। কেউ যাতে তিনটি বিয়ে না করে— Dowry, Debt and Dirty game, Polygamyবা নিন্দনীয় বহুবিবাহ কন্ট্রোল করার জন্য হয়ত ঈশ্বর এই ফর্মান জারি করে থাকতে পারেন। ঈশ্বরের কথা মনে রেখে ব্যারামবিলাসের কোন পাঠকের যদি একাধিক স্ত্রী-রত্ন আহরণেবসুপ্ত বাসনা থাকে তবে অচিরাৎ এ বাসনা ত্যাগ করবেন। আমার ধারণার যৌক্তিকতা পণ্ডিতরা বিবেচনা করে দেখবেন আশা রাখি। কিন্তু আমার মত শাস্ত্রকারেরা মানলে ভালো, আর না মানলেও তিন স্ত্রী ও তিন শালা বা তিন শ্যালক থাকাটা মঙ্গলপ্রদ নয় এটা আপনিও হয়তো মানবেন।

যাক, নাচতে নেমে ঘোমটা টেনে লাভ নেই। শালাকে নিয়ে আরো কিছু প্রিয়-অপ্রিয় কথা জমা আছে। আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বহুতর ধনের উদার দাতা বলেই ঋষি গেয়েছেন শালার এতো সাতকাহণ প্রশস্তি। তাই শালাকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা নাচা-নাচি। শালার এতো রমরমা। কন্যাপণের বীজ যা আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে তা বেদের যুগেই রোপণ করা হয়েছিল, পণ্ডিতরা মানুন আর নাই মানুন। বেদ-উপনিষদ-শাস্ত্র-গ্রন্থকে আঁকড়ে ধরেই— ধর্মগ্রন্থের আশ্রয়ে তার অপব্যাখ্যা করেই ভ্রষ্টাচার সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে চিরকাল। আজও তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

পিতার প্রতিনিধি হিসেবে বেদের যুগে কন্যাভ্রাতাই কন্যা দান করতেন, সম্প্রদান করতেন। আমার মনে হয়, পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ পুত্র বা কন্যাভ্রাতা সানন্দে এই কর্মটি করতেন, অন্যথায় নয়। কারণ পিতা 'বহুতর' ধন উপার্জন করে রাখতেন পুত্র ও কন্যার প্রীত্যর্থে। তাই বলা হয়েছে স্যাল্ বা শ্যালক সানন্দে 'ভগিনীপ্রীত্যর্থং বহুতরং প্রযচ্ছতি।' বিনা স্বার্থে মানুষ স্নেহ-জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ তেলের অপচয় করে না। অপাত্রে তেল ঢালে না। বহুতর ধন পেলে কে না শালাকে ভালোবাসবে। তাই ভারতের তপোবনের সভ্যতা তথা সমাজ পত্তনের গোড়া থেকেই আমার ধারণা, শালার এত আদর আর ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা।

কালক্রমে ভগিনীপ্রীত্যর্থে স্যালঃ বা শ্যালকের নৈতিক দায়বদ্ধতা হ্রাস পায়— ক্রমশ তা শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকে। কিন্তু শালার জনপ্রিয়তা পূর্বের মতোই বহাল থাকে। অধিকন্তু শালারা ভগিনী-পতিদের ঘাড়ে সিন্ধবাদের বুড়োর মতো চেপে বসেন। 'গৃহিণীর ভ্রাতা'দের পোয়া বারো হয়। দায়িত্ব-কর্তব্যের বালাই নেই অথচ আদর-আবদারের বেলায় ষোল আনা। এ যেন 'ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোঁসাই।'

পরিশেষে শ্যালক-তত্ত্বের পাঠকের জ্ঞাতার্থে একটি গুহ্য তথ্য। এ নিবন্ধকার নিমিত্ত মাত্র; দায় দায়িত্ব তাঁর নয়। 'শনিবারের চিঠি'তে একবার শালা-ইজম্ নিয়ে বিতর্কমূলক লেখালেখি চলছিল। (বাংলা সাহিত্য জগতের বিতর্কিত পত্র 'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার শার্লক হোমস্ ব্যোমকেশ বক্সীর স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অনবদ্য রম্যরচনা প্রকাশিত হয়। এতে তিনি 'কমরেড' শব্দের বাংলা করেছিলেন খাঁটি নির্ভেজাল 'শালা'। তাঁর যুক্তিতে 'শালা' শব্দটির মধ্যে নাকি একটা আপন-করা আবেদন আছে। তাই তাঁর বিচারে 'কমরেড' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে আড়াই অক্ষরের এটিই যথোপযুক্ত।

সু-সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রম্যনিবন্ধে প্রস্তাব রেখেছিলেন একে অপরকে 'শালা'র মতো মধুর সম্ভাষণে আহ্বান করার প্রথা চালু করার; আশা প্রকাশ করেছিলেন একদিন হয়ত আসমুদ্র-হিমাচল শালা-শালা ধ্বনিতে মুখরিত হবে। কারণ এমন মধুর সম্বন্ধ ও সম্বোধন বিরল। আর শালা-ইজমের প্রবক্তা হিসেবে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছেন শরদিন্দু—

'জয়! শালা সজনীকান্ত দাস কী জয়!
জয়! শালা বনফুল কী জয়!!
জয়! শালা পরিমল গোস্বামী কী জয়!!'

অবশ্য সুরসিক সজনীকান্ত তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন উক্ত রচনাটির নীচে ফুটনোটে

একটি মাত্র তীর্যক বাক্যে—

*"'কমরেড' শব্দের প্রতিশব্দের জন্য শালা লেখককে
(শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে) ধন্যবাদ।" — সম্পাদক শনিবারের চিঠি
ভাদ্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন ভাবতে পারেননি এক কৃতবিদ্য কমরেড কৃতিত্বের সঙ্গে একটানা সিকি শতাব্দী পশ্চিম বঙ্গ শাসন করে ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে নয়া নজীর স্থাপন করবেন। তাহলে হয়ত 'কমরেড' শব্দের নিজস্ব অনুবাদ তথা প্রতিশব্দ চয়ন করতে দ্বিতীয় বার চিন্তা করতেন।

*মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপরিহার্য শালার 'শূর্প' অর্থাৎ ঋগ্বেদের কুলো।
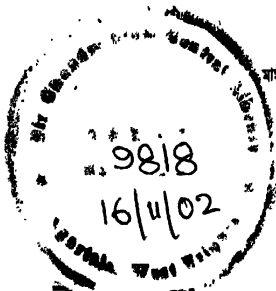
'শালা' বিষয়ক একটি কিঞ্চিৎ আপত্তিকর গল্প।
শ্রদ্ধেয়া ভদ্রমহিলারা, ভিক্টোরিয়ান্ শুচিবাই অথবা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও অজীর্ণদোষ থাকিলে 'হাইড্রোসিল্'এর স্থলে 'টন্‌সিল্' পড়িবেন। অন্যথায়, এই অধমকে মহাপাতকী করিবেন না।

গল্পের আঙ্গিনায় পণ্ডিতি ফলানোর প্রয়াস না নেয়াই ভালো। এতে গল্পের মেজাজ নষ্ট হবার ষোল আনা সম্ভাবনা। 'শালা' প্রসঙ্গে সাতকাহণ, বেদ-উপনিষদের ভায্যের মতো গুরুপাক বিষয়ের অবতারণা হয়ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। পাঠকের বিরক্তি আসা স্বাভাবিক। লঘু বিষয়ে অযথা গুরুত্ব আরোপ না করে, বিষয়টিকে একটু তরল করাই শ্রেয় । একটি ক্ষুদ্রতম পরিচিতির পরিমণ্ডলে কথার পৃষ্ঠে দু'চারখানা কথা বলার ও ধার কর্জ করে মওকা-মাফিক গল্পগাছা করার বদনাম আমার আছে। এই স্থলে, শালা প্রসঙ্গটি একটু গেরামভারি হয়ে গেল বলে একটি শালা-বিষয়ক লঘু গল্পের অবতারণা করা নিন্দনীয় হবে না। এখন 'শালা'র গল্প পাই কোথায় বলুন! বহু-কথিত, বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে প্রচলিত একটা পুরানো গল্পই ঝেড়েঝুড়ে দেখি রসিক সজ্জনদেরপাতে দেয়া যায় কিনা।

গল্পটি খুব অর্বাচীন নয়। অনেক কৃতবিদ্য মহাজন এটি নিজের বলে চালিয়েছেন। গল্পটি শোনার আগে, একটু ধৈর্য্য ধরে আসুন আমরা এর উৎসমূল খুঁজে দেখি এটির উৎপত্তির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কি ইঙ্গিত করে। তেমন প্রবীণ নন এমন ব্যক্তিরা আশা করি স্মরণ করতে কষ্ট হবে না, পশ্চিমবঙ্গের এক দোআঁস্‌লা মন্ত্রীসভার কথা। ক্ষণস্থায়ী ঐ সঙ্কর-জাতীয় মন্ত্রীসভার একজন করিৎকর্মা তালেবর খলিফা মন্ত্রী সম্বন্ধে এই 'মন্ত্রী-বিদ্বেষী' গল্পটি লোকমুখে বাজারে প্রচলিত হয়। গল্পটি তবে শোনা যাক—

এই গল্পের শালাটি যেমন বুনো ওল, ভগ্নীপতিটিও তেমনিই বাঘা তেঁতুল। হয়ত বা শালার চেয়ে আমাদের গল্পের ভগ্নীপতিটি এক কাঠি সরেস। গল্পটি এমন— জনৈক কুবুদ্ধি-প্রবণ প্রৌঢ় ভগ্নিপতি ভদ্রলোকের জনৈক তীক্ষ্ণবুদ্ধি 'শালা' আপন প্রতিভাবলে, অর্থাৎ জী-হুজুর, চালাকী, বিদ্যাহীনতা, শঠতা-ধূর্ততা ও বালী-

সুগ্রীবাদি সহচরবৃন্দের বাহুবলে বলীয়ান হয়ে মন্ত্রীত্বে উন্নিত হয়েছিলেন। মন্ত্রী হয়ে ইনি যথারীতি আপন কর্তব্য সম্পাদন করছিলেন, অর্থাৎ ভানুমতির খেল্ দেখাচ্ছিলেন।

প্রথমেই তিনি রাক্ষসের মতো খাদ্য দপ্তরে 'হাত' দিলেন— বাজার থেকে চাল-গম উধাও। কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ অচিরে তিনি বস্ত্র দপ্তরে উন্নিত হলেন। জনগণের শেষ সম্বল পশ্চাদ্দেশের কাপড়ে 'হাত' দিলেন— যথারীতি বেতমিজ্ পাব্লিকের পরিধানে উলঙ্গ-বাহার 'বার্থ-ডে-স্যুট্'। বাজার থেকে পাবলিকরে কোমর থেকে কাপড় লোপাট। কালক্রমে প্রতিপক্ষকে ল্যাঙ্গী মেরে তিনি জনসম্ভরণ দপ্তরে 'হাত' দিলেন— বাজার থেকে সিমেন্ট-রড়-ইট-কাঠ হাওয়া। কফিনের শেষ পেরেকটি হাতে নিয়ে তারপর তিনি শিক্ষা দপ্তরে 'হাত' দিলেন— বাজার থেকে পাঠ্য-পুস্তক-খাতা-কলম নিশ্চিহ্ন! অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র সুলভ মূল্যে বাজারে উপলব্ধ!

উক্ত 'শালা'র কৃতিত্বের কথা একদিন তাঁর শ্রদ্ধেয় ভগ্নিপতির কানে আসে। বলা বাহুল্য তাঁর ভগ্নিপতি একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়া ছিলেন। সম্প্রতি তিনি একটি জটিল লজ্জাজনক রোগে ভূগছিলেন। লোক মারফৎ শালাবাবুর কাছে একটি জরুরী পত্র লিখে পাঠালেন—

আদরণীয় শালাবাবু —

তুমি অমুক পার্টির রত্নস্বরূপ! মন্ত্রী হইয়া তোমার কল্যাণ হস্তের স্পর্শে দেশবাসীর উপকার করিতেছ দেখিয়া আমার আহ্লাদের সীমা নাই। সম্প্রতি তুমি স্বাস্থ্য বিভাগে হাত দিয়াছ জানিয়া আমি আরো আনন্দিত। আমি দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত; যেই রোগে ভুগিতেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র তুমিই আমাকে আরোগ্য করিতে পারে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধপত্র পাওয়া মাত্র একবার আসিয়া, তোমার যতই রাজকার্য থাকুক, ভগ্নিপতির প্রাণ রক্ষা করিয়া স্বীয় ভগিনীর সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় করিতে যত্নবান হইবে।

ইতি— তোমার
আদি ও অকৃত্রিম ভগ্নীপতি।

আমাদের উক্ত আলোচিত এলেমদার শালা-মন্ত্রী অথবা মন্ত্রী-শালা (পাঠক স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে যা পছন্দ করেন বলতেপারেন। ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকুন তিনি ঈশ্বরই) পড়ি মরি করে, সরকারী গাড়ির কন্‌ভয় হাকিয়ে— মন্ত্রীদের খুব ভয়, কন্‌ভয় ছাড়া চলে না, জামাই বাবু সকাশে ল্যাজ (ল্যাজ মন্ত্রীদের আছে, থাকে। যত বড় মন্ত্রী তত বড় ল্যাজ। আবার ছোট ছোট মন্ত্রীর বড়ো বড়ো ল্যাজও হয়।) পিঠে ফেলে দৌঁড়ে আসেন। এসে দেখেন জামাই-বাবুর অসুস্থতার কোন লক্ষণ নেই। বহাল তবিয়তে, বেশ খোশ মেজাজে আছেন। হেসে বলেন, 'ভাই এলে? কি যে আনন্দ হচ্ছে তোমাকে দেখে। দেশের জন্য খেটে খেটে তোমার ভুড়ি বেড়ে গেছে দেখছি! এসো দু'দণ্ড রসালাপ করি দুজনে।' বলা বাহুল্য ঈদৃশ রসিকতায় মন্ত্রীবর রেগে মেগে অস্থির। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বলেন—

—জাম্বু! এই 'খাজুইর‍্যা আলাপ' করনের লাইগ্যা বুঝি আমারে তরিঘড়ি ডাইক্যা আনছেন?

—খাজুইর‍্যা আলাপ! আমি তোমার লগে খাজুইর‍্যা আলাপ করি?

—হ। দুনিয়ার খাজুইর‍্যা আলাপ করতাছেন আপনে। জানেন, একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী আমি! আমার কত গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম...'

—কী অক্করে এমুন প্রোগ্রাম তোমার?

—তয়, হোনেন। চাইরট্টা তেতাল্লিশে আমার একটা সুলভ শৌচাগারের ফিতা কাটতে অইব। পাঁচটা পঞ্চান্নয়, পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে শ্রেষ্ঠ গাঁওপ্রধানা করিৎকর্মা, শ্রীমতি বাতাসীর মা'র সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। আমারে চিপ্ গেষ্ট করনের লাইগ্যা চিপ্ ছেক্রেটারী (মন্ত্রীর মতে ভেরী চিপ্ ছেক্রেটারী, খুব সস্তা ছেক্রেটারী!) ইত্যাদি, আরও কত আমলা-কামলা অন্ন-জল ছাইর‍্যা দিয়া বইয়া রইছে। এর মইধ্যে আপনের এই বিটলামি ভালা লাগে নি? অহন, তালিবালি না কইর‍্যা আসল বিষয়ডা কিতা একটু ঝাইড়্যা কাসেন চাই!

এত কথার পরও জামাইবাবুর কোন হেল্‌দোল্ নেই। শালাকে কিছু উপদেশ দিলেন। মেজাজ গরম করে দেশের সেবা করা যায় না, ভোটারের গলা কাটা যায় না, এ কথাও মনে করিয়ে দিলেন। অনেক ভ্যান্‌তাড়া করে তারপর মোক্ষম কথাটি পাড়লেন—

—ভাই! চেতঅ কেরে (চটে যাচ্ছ কেন)? তোমার হাতের গুণ আছে দেইখ্যা তোমারে ডাকছি। তুমি চাল-গমে হাত দিলা, চাল-গম উধাও। কাপড়ে হাত দিলা কাপড় লোপাট। সিমেন্টে হাত দিলা সিমেন্ট ভেনিস্। শিক্ষায় হাত দিলা পাইঠ্য-পুস্তক-কাগজ-কলম হাওয়া। অহন আবার স্বাস্থ্যে হাত দিছ। অহন অষুধ-পাতি উধাও অইব— তুমি ত জান, আজগা আস্ট বচ্চর আমি হাইড্রোসিলে কষ্ট পাইতাছি! অহন, তুমি আমার হাইড্রোসিল্ডাত্ যুদি ইট্টু হাত বুলাইয়া দিয়া যাও... তোমার হাতের গুণে আমি রোগ-বালাই মুক্ত হই। তেমার মতঅ এমুন কৃতবিদ্য অলেবর শালা থাকতে এই বয়সে আর কাডাচিড়িত্ (অপারেশনে) যাইতাম কেরে?'

গল্পটি এখানেই শেষ কবা উচিত। 'শালা'-প্রসঙ্গও এখানেই শেষ। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল বাঞ্ছনীয় নয়। 'শালা' প্রসঙ্গে শালিরা ব্রাত্য হতে পারেন না। বরঞ্চ, শালিদের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষ-পাতিত্বই অভিপ্রেত। যদি কোন 'মন্ত্রী-শালি' বা 'শালি-মন্ত্রী'র হদিস পাই, কোন সরস কাহিনী সংগ্রহ করতে পারি, শালিদেব সাতকাহণ, শালিদের পক্ষে আমার শালিসী, শালীন আলোচনা বাবান্তরে উপস্থাপন করার বাসনা রইল আমার। এবার আমার আপনার শ্যালিকা না হলেও, আমরা 'শালিকা' সুলোচনাব গল্প শুনব।

শ্যালিকা-সমাচার

সামান্য মনুষ্য নহ, নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা ... ...
মুখে তব মধু হাসি ঢালা,
হে শ্যালক, হে আদৎ শালা!
— বনফুল

'শালা'কে অবলম্বন করেই শ্যালিকা-সমাচারের বিসমিল্লা করতে হয়। 'শালা' যদি সামান্য মনুষ্য না হন, শ্যালিকাও সামান্যা মানবী নহেন' একথা আমরা বলতেই পারি। আধি-ঘরওয়ালীদের আমরা প্রতারণা করব না; প্রাপ্য মর্যাদা দেব। যথা সময়েই শ্যালিকা-প্রসঙ্গে যাব। শালা-সন্দেশই শালা সমাচার। বাংলার শালা, বাঙালের 'হালা'ই হিন্দুস্তানী প্যারে 'সালে'। গৃহিণীর মানেই শালার মান। মহাভারতও গেয়েছেন শালা 'কিচক'এর গুণগান।

যুগ-ধর্মের প্রকোপে, পরিবার সঙ্কোচনের সরকারী দাপটে শালারা, শ্যালিকারা আজ বিপন্ন প্রজাতির জীব। আজ শ্বশুড়ালয় মরুভূমি শালাহীন, শ্যালিকাহীন। আজ আর কোথায় বিত্তশালী শালিবাহনেরা। অনেকেই আমার মতো শ্যালিকাহীন। অশালীন আমাকে যেমন শ্বশুড় বাড়ি গেলে শ্যালিকার অভাবে উঠোনের দুটো নারকেল গাছের সঙ্গে গল্প করতে হয়। হায়! জামাতা বাবাজীরা! হায়! বাবু রামকুমার চট্টোপাধ্যায়! আপনি আর গাইবেন না নিধুবাবুর টপ্পা--

বাটা ভরে এনে পান, শালিরা সব করবে দান।
হানবে তারা নয়নবাণ,
ছড়িয়ে রূপের ফুলঝুড়ি।
যাব নতুন শ্বশুড় বাড়ি....'

নিয়ন্ত্রিত ও নির্যাতিত পরিবার কল্যাণের যুগে আজ শালা ও শালিকাদের বড়ো আকাল। কত শ্বশুড়ালয় আজ শালিহীন, মরুময়। শালা নেই কে আর

জামাইবাবুকে 'কহতরং ধনং প্রযচ্ছতি?' কোথায় শালি যিনি জামাইবাবুদের মনোরঞ্জন করবেন! শালি নেই মোটে কে আর বাটাভরে এনে পান জামাইবাবুকে করবে দান। একমাত্র ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবেরই ভক্তের অভাব নেই, শালারও অভাব নেই। শালারা চিরকালই ভগবানকে সন্দেশ যুগিয়েছে। শালারা রাঁড় বাড়িও গিয়েছে— ঠাকুরবাড়িও গিয়েছে। আজও যাচ্ছে। সেই অর্থে শালার আভাব নেই। রাঁড়বাড়ি যায়, ঠাকুরবাড়িও যায় এমন শালাদের ছড়াছড়ি আজকাল।

বিশ্বকবি দু'চার ছত্রে শালিকাদের গুণগান করেছেন। পক্ষপাতিত্ব বশতঃ ছোট শালিকে একটু বেশীই খাতির করেছেন। রসিক পাঠক তা বিলক্ষণ জানেন। শালিকা সম্পর্কে অনেক মহাপুরুষই অনেক আপ্তবাক্য, স্তুতি-প্রসস্তি রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই ছড়াটির উল্লেখ না করলে রৌরব নরকে পচে মরে আমাকে মহাপাতকী হতে হবে। শালিকারাও আমাকে ক্ষমা করবেন না।— এটি একটি উৎকৃষ্ট মজার ছড়া। বীরের ছাঁদে বর! গালেতে গাল পাট্টা। বীর বলে কি তার রসবোধ থাকতে নেই! শ্যালিকার সাথে কৌতুক করার অধিকার নেই! অবশ্যই আছে। তবুও শ্বশুড়মশাই কেন যে মেয়ের শোকে কাঁদেন! শ্যালিকাকে নিয়ে অনেক মহাপুরুষই রসের বন্যা ছুটিয়েছেন। কিন্তু এমন অনবদ্য রস-সৃষ্টি আর কোথাও নজরে পড়ছে কি? হায়! কোথায় গেল রায়বেঁশে নাচ? কে চেনে গুরুসদয় দত্তকে! কে জানে ব্রতচারী কাকে বলে, রায়বেঁশে নাচই বা কি?

বর এসেছে বীরের ছাদে, বিয়ের লগ্ন আটটা;
পিতল-আঁটা লাঠি কাধে, গালেতে গালপাট্টা।
শালির সাথে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচার ঝোকে মাথায় মারে গাট্টা।
শ্বশুড় কাঁদে মেয়ের শোকে বর হেসে কর ঠাট্টা।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বীরের ছাদে বিয়ে করতে গিয়ে এমন মর্মান্তিক রসিকতা যেন কেউ না করেন। শ্যালিকাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন। সালে-প্রিয়, সালের পৃষ্ঠপোষক হিন্দুস্তনী

'ভাইয়া'রা অবশ্য এ ব্যপারে অগ্রণী। তাঁরা সেই বিখ্যাত প্রবচনের জন্মদাতা, যা আজও এই শালিকাদের আকালের যুগেও সমান জনপ্রিয় ও সর্বত্র প্রায়শ উক্ত— তাঁরা বলে থাকেন, 'শালি আধি-ঘরওয়ালী'।

এ স্থলে কিঞ্চিৎ জ্ঞান বিতরণ করার অর্থাৎ ফর্‌ফর করার অবকাশ দেখতে পাচ্ছি। 'গণ্ডুষ-জলমাত্রেণ সফরী ফর্‌ফরায়তে'। 'সফরী' বা পুটি মাছ অল্প জলেই আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর একথা বলেছেন। সেতো আপনার জানাই আছে। তবুও শালিকা-জামাইবাবুর সম্পর্কের সামাজিক ভিত্তিটা কেমন শক্ত একটু খুঁজে দেখা দোষের হবে না।

আমাদের হিন্দুস্তানী ভাইয়ারা, দেশোয়ালী বেরাদরেরা যে বলেন, 'শালি, আধি-ঘরওয়ালী'। সাচ্চি বাত, হক্‌ কথাই বলেন তাঁরা। উন্নাসিক পণ্ডিতেরাও মানেন, এক কালে শ্যালিকার উপর জামাই-বাবুদেরই স্বীকৃত স্বত্ব-স্বামীত্ব ছিল। তাই শ্যালিকার বিবাহের প্রাক-মুহূর্তে জামাইবাবুদেরকে রীতিমতো স্তুতি-তোয়াজ করে, তেল দিয়ে শ্যালিকার স্বত্ব ত্যাগে রাজী করানো হত। এই তেল দেয়ার অনুষ্ঠানটিই অবশ্য পালনীয় লোকাচার 'জামাইবরণ'। এটি আজও হিন্দু পরিবারে কন্যার বিয়ের একটি অত্যাবশ্যক ক্রিয়াকাণ্ডের পর্যায়ে পড়ে। মনের মতো পারিতোষিক পেলেই জামাতা বাবাজীরা শ্যালিকার 'অধিকার' ছেড়ে দিতেন। জামাইবাবুর ইজাজত্‌ পেলেই শ্যালিকা সাদী কবুল করতে পারতেন। Golden Age, Polygamy'র সেই স্বর্ণ-যুগে অন্যথায় শ্যালিকারা জামাইবাবুদেরই স্থায়ী আমানত বলে গণ্য হতেন

আমাদের কৈশোরের নিত্যসঙ্গী, চিরকুমার শিব্রাম চক্‌রবর্‌তি, আমাদের শিব্রামদা ঘরণীর বিকল্প খুঁজেছেন। তিনি অবশ্য বিকল্প হিসেবে শ্যালিকাদের কথা বলেন নি। রাজা শালিবাহন শ্যালিকাদের বহন করতেন, না কি শ্যালিকারা তাঁর শিবিকা বহন করতেন জানি না। শালি-পরিবৃত হয়ে থাকতেন তিনি এমন কথাও প্রাচীন সাহিত্য বলে না। 'শালি' শব্দটা এক্ষেত্রে ভিন্ন দ্যোতনা, ভিন্ন অর্থ বহন

করলেও ধ্বনি-সামঞ্জস্যের জন্যই রাজার নামটি অনেকেরই প্রিয়। আমি মনে করি,যাঁর শালি আছে একাধিক তিনিই যথার্থ 'বিত্তশালী'। যাঁর শালি নেই আদৌ তিনিই রীতিমতো 'অশালীন'।

শালি বা শ্যালিকারা, সাহেবদের Sister-in-law (অর্থাৎ আইনসিদ্ধ ভগিনীরা) আসলে খুবই ডেলিকেট্ বস্তু বা প্রাণী। তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা, খবরের কাগজের ভাষায় 'স্পর্শকাতর' ইস্যু। অশালীন কিছু লেখা সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। শ্যালিকাদের আমি ভয় করি। শ্যালিকাকে না ছুঁয়েই এক 'শালিকা'র গল্প আমরা করব। এবার 'শালিকা সমাচার'। সুরূপা শালিকা সুলোচনা, তার স্বামী অথবা প্রেমিক কানাকেষ্ট ও আওয়ারা, লাফাঙ্গা খঞ্জর খানকে নিয়ে একটি গল্প আমরা শুনব যথা সময়ে।
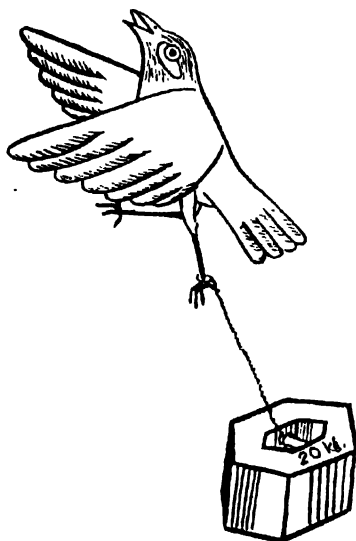
সুলোচনার Weight-Lifting

পর্ব-৩

কানাকেষ্ট, খঞ্জর খান ও 'শালিকা' সুলোচনার গল্প

এখন এক 'শালিকা'র কথা শোনব আমরা। অনুপম-অনুপমা এক তত-প্রাচীন নয় এমন এক দম্পতি যাদের মধ্যে খাঁটি প্রেম এখনো কিছুটা রয়ে গেছে। অনুপম অফিসে যাবার আগের সময়টা বারান্দায় বসে অনুপমার দেয়া চা-মুড়ি-মুড়ি-চা অথবা চা-বিস্কুট-বিস্কুট-চা খেয়েই কাটিয়ে দেয়। অনুপমের প্রাতরাশ 'চা-মুড়ি-মুড়ি-চা অথবা চা-বিস্কুট-বিস্কুট-চা' তার লাঞ্চ 'ডাল আর আলুভাজা-আলুভাজা আর ডাল'এর মতোই একঘেয়েমি এড়ানোর জন্য একই মাল নেড়ে চেড়ে খাওয়া! যাক, তার প্রাতরাশ-জলখাবার-ব্রেকফাস্টের অনেক দিনের সঙ্গী কানাকেষ্ট, খঞ্জর খান ও সুলোচনা।

অন্তত কানা কেষ্ট ও সুলোচনা, এ দুজনের সাথে দেখা না হলে, অনুপমের ধারণা তার দিনটি বৃথা যাবে। অশুভ যাবে। ইদানিং কানাকেষ্ট ও সুলোচনা একটু অনিয়মিত আসে। অনুপমের পাশের বাড়িটা,'সুবর্ণ-ভিলা' তিনতলা ছবির মতো বাড়িটা হওয়ার পর থেকে এমনটি ঘটছে। অনুপমের একটু হিংসে হয়— এই বাড়িটির গৃহস্বামী স্বর্ণকমল বাবু অর্থাৎ মিঃ এস. কে. সেন, কাষ্টম্স ইন্সপেক্টর, রাজা মিডাস্ রোজ সকালে নাকি সোনার বিস্কুট সহযোগে সোনালী চা খান। জনৈকা পরিচারিকা মারফৎ খবরটি অনুপমা তথা অনুপমের কানে আসে। এটাও কানে আসে যে আজকাল কানাকেষ্ট ও সুলোচনা সোনার বিস্কুট খাওয়ার লোভে স্বর্ণকমল বাবুর বাড়িতেই ঘুর্‌ঘুর্ করে। অনুপমের ছড়ানো ছিটানো মুড়ি-বিস্কুট উঠোনে পড়ে থাকে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বিষয়ী ও সঞ্চয়ী পিঁপড়েরা টেনে নিয়ে যায়।

অথচ এই সেদিনও অনুপমা অনুপমকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে খঞ্জর খান ও সুলোচনার নিবিড় দিব্যপ্রেম। নিজের স্বামীর উদাসীনতায় রীতিমতো আহত, ক্ষুব্ধ অনুপমা সখেদে বলেছে—

— দেখো, দেখে শেখো। সখা, ভালোবাসা কারে কয়!

— কী দেখব, কী শিখব?

— দেখ। খঞ্জর খান কেমন নিজে মুড়ি খেয়ে বিস্কুটের গুঁড়োগুলো সুলোচনার মুখে তুলে দিচ্ছে। হায়! স্ত্রীর প্রতি এই খাঁটি দরদটুকুও যদি অন্তত তোমার থাকত!

— ফুঃ! সুলোচনা ওর স্ত্রীই নয়। ঈশ্বর জানেন কী সম্পর্ক!

— তোমাকে বলেছে!

— বুদ্ধিমানকে সব কিছু বলে দিতে হয় না। নিজের স্ত্রীর দিকে কেউ অমন গরু-চোরের মতো চায়? এমন ঘোর-লাগা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়? ন্যাকামো, আদিখ্যেতা করে?

— তা হলে সুলোচনা খঞ্জর খানের কে?

— বৌ নয় মোটেই। শালিকা, বেয়ান বা বৌদি-টৌদি হলেও হতে পারে। অথবা পরস্ত্রী, সাদা বাংলায় অবৈধ প্রেমিকা...

— তোমার মাথা!

অনুপম-অনুপমার মাথায় কানাকেষ্ট ও সুলোচনার সম্পর্ক নিয়ে যাই ভাবনা খেলে বেড়াক, আসুন আমরা এখন কানাকেষ্ট-সুলোচনার ইতিবৃত্ত আলোচনা করি আমাদের গল্পের স্বার্থে।

বেচারা কানাকেষ্টর একটি চোখ কানা। যৌবনের চাপল্য বশতঃ অথবা কোন দুর্ঘটনায়ও এটা হতে পারে। কানাকেষ্টর প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা এবং ঘৃণা অনুপমার বরাবরই আছে। নামটিও তারই দেয়া। সুলোচনা, সত্যিই রীতিমতো সুন্দরী! বিশেষ করে তার হলুদ ওষ্ঠরঞ্জনী রঞ্জিত ওষ্ঠ, উজ্জ্বল ছাই-ছাই তেল-চিক্কণ শ্যামবর্ণ, নিটোল স্বাস্থ্য! তার হলুদ ভ্রূযুগল শোভিত কালো চপল খঞ্জন চোখ অনুপমকে যথেষ্টই মুগ্ধ করে যদিও সুলোচনার চরিত্র সম্পর্কে তার মন সন্দেহমুক্ত নয়। সুলোচনা নামটি অনুপমেরই দেয়া। শুধু মুড়ি-বিস্কুট-বিস্কুট-মুড়ি দিনের পর দিন খেয়ে খেয়ে কি করে এত রূপ-যৌবনের বাহার খোলে সেটা অনুপমের ধারণায় কুলোয় না। অনুপমা বলে— প্রেমই আসল। ভালোবাসা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে ভালোবাসা, প্রেম এ থেকেই কানাকেষ্ট ও সুলোচনার অফুরন্ত জীবনী শক্তি আর সৌন্দর্যের রসদ মিলে।

এ সব তত্ত্বকথা থাক। অকৃতজ্ঞ কানাকেষ্ট-খঞ্জর খান ও সুলোচনা! সোনার বিস্কুট ও নানান বিজাতীয় সুখাদ্যের লোভে হ্যাংলার মতো পড়ে আছে সুবর্ণ-ভিলায়। এই তিন জুটি, এ পাড়ার রাজা মিডাস, ধনবান স্বর্ণকমল বাবু তথা মিঃ সেনের স্বর্ণময় সংসারে অনুপ্রবেশ করে তাদের প্রতি আসক্ত হয়েপড়ায় সমূহ সর্বনাশ হচ্ছে অনুপম অনুপমার।

অপুরণীয় ক্ষতি হচ্ছে অনুপম-পরিবারের। তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ আরো যে সব ভারী ভারী শব্দ আজকাল সিকি-আধুলী-পাতি নেতাদের মুখে শোনা যায়, সবই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অনুপমের প্রশ্ন—

— কানাকেষ্টর প্রতি তোমার এত হিংসে আর জ্বলুনি কেন?

— সুলোচনাকেই বা তুমি ভ্রষ্টা দুষ্টা সন্দেহ কর কেন?

— তোমার সুলোচনাকে আমি নিজের চোখে লাফাঙ্গা খঞ্জর খানের সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম মেলামেশা করতে দেখেছি; নাচতে দেখেছি।

— দোষ নেই। লাফাঙ্গা বলবে না, শ্রীমান খঞ্জর খানই তার স্বামী।

— ভুল। সুলোচনা কানাকেষ্ট'র ধর্মপত্নী ....

— কে ধর্মপত্নী আর কে ধর্মপতি কে মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় টের পায়। তুমি বুঝবে না। ওদের অপেক্ষায় থেকে থেকে তোমার অফিসের দেরী হবে। One for sorrow... Two for joy আজ একটাও দেখলে না। আজ কপালে তোমার দুঃখও নেই আনন্দও নেই। দেখো, কেমন নেহাত পানসে আলুনি সাদামাটা যাবে তোমার দিনটা...

তা হলে এ পর্যন্ত আমরা তিনটি চরিত্র পেলাম। কানাকেষ্ট, সুলোচনা ও লাফাঙ্গা খঞ্জর খান। কানাকেষ্ট কোন সুপুরুষ নয়; অন্তত সুলোচনার পাশে দাঁড়ানোর যোগ্যতা তার নেই। অনুপমাও এটা মানে। সুবচনী সুলোচনা, আমরা আগেই জেনেছি রীতিমতো সুন্দরী। 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ'। 'সুচেতনা'র স্থলে ঘনশ্যামবর্ণা সুলোচনাকে নিয়ে উৎসাহী অনুপম একটু বাড়াবাড়ি রকমের আদিখ্যেতা করে ফেলে মাঝেমধ্যে— মূর্খের মতো অপ্রাসঙ্গিক জীবনানন্দ কোট্ করে, তাও আবার ভুলভাল—

সুলোচনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ,
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে; ... ...
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়...

অনুপমার ধমকে শেষপর্যন্ত অনধিকার চর্চা থেকে একসময় বিরতও হয়। তা হলে বাকি রইল লাফাঙ্গা খান। অনুপম বোম্বাই-মার্কা লাফাঙ্গা খঞ্জর খানের প্রতি বিরূপ। তার ধারণা, লাফাঙ্গা খান বোকা কানাকেষ্টর দৈহিক ত্রুটি ও সৌন্দর্যহীনতার সুযোগ নিয়ে সুলোচনার প্রতি আসক্ত। আর সুলোচনাও তার অবদমিত আকাঙ্খা চরিতার্থ করছে লাফাঙ্গা খানকে প্রশ্রয় দিয়ে, যা রীতিমতো নীতিবিগর্হিত কর্ম।

তদুপরি, অতি সম্প্রতি ধবান, স্বর্ণবান, সুবর্ণ-ভিলার মহারাজ স্বর্ণকমল বাবু ও তার পরিবারের প্রতি কানাকেষ্ট ও সুলোচনার পক্ষপাতিত্বকে উভয়েরই ধর্মহীনতা ও অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করে। অগত্যা অনুপম-অনুপমা, ক্ষুন্নমনে তাদের দিনগত পাপক্ষয়ে আত্মনিয়োগ করে।

এদিকে পাচিলের ও পাশে, সুবর্ণ-ভিলায় স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে সুলোচনা কানাকেষ্ট ও খঞ্জর খানের কলকাকলি। স্বর্ণকমল বাবু ও স্বর্ণলতা দেবীর দুটি ভারী ভারী ছেলেমেয়ে নিয়ে সোনার সংসার। অনুপমা একদিন যেচে আলাপও করে এসেছে। তবে অভিজ্ঞতা সুখের নয়। সকালে তারা চা-মুড়ি-মুড়ি-চা বা চা-বিস্কুট-বিস্কুট-চা'য় নাস্তা করে না। তারা যা করে সেটা রীতিমতো ব্রেকফাস্ট। নানান বিজাতীযখাদ্যসামগ্রী মজুদ থাকে তাদের খানা-টেবিলে। খাদ্য-খাদকের ফিরিস্তি দিতেই টানা আধাঘন্টা সময় নেন স্বর্ণলতা দেবী। তারপর আসে অলঙ্কারাদি, সোনা-রূপা-ইট-কাঠ-পাথর-হিরা-জহরৎ-মনি-মুক্তোর মতো প্রসঙ্গ। গোবেচারী অনুপমা অনভিজ্ঞতা ও সম্পদহীনতার সনাতন হীনমন্যতা হেতু খুব একটা সুবিধে করতে পারে নি। তবে স্বচক্ষে দেখে এসেছে সুলোচনা ও কানাকেষ্টর অকৃতজ্ঞতা, নেমকহারামী,হ্যাংলামো। অনুপমাকে পাত্তাই দিল না ওরা। চপ্-কাটলেট্ পান্তুয়া-লেডিকেনী-সন্দেশ সহযোগে ওরাও ব্রেকফাস্ট করছে। স্বর্ণকমল বাবু বা মিঃ সেনের ভারী ভারী ছেলেমেয়েদের সাথে দিব্যি লুকোচুরিও খেলছে।

আজ তৃতীয় দিন। আজও সারা উঠোনে দুর্মূল্য মুড়ি-বিস্কুট ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে অনুপম। খুব মন খারাপ অনুপমের। মন খারাপ অনুপমারও। সকালবেলাটা তাদের দিব্যি কাটতকানাকেষ্ট আর সুলোচনার সান্নিধ্যে। কপালে সইলো না। অফিসে অনুপমের দিনগুলো কাটে নিতান্ত পানসে, নিরানন্দ। আজও দিনটি তেমনি কাটত! কিন্তু হঠাৎ একটি শোরগোল শুরু হয়। এ পাড়ায় যে এতো আত্মীয়-কুটুম্ব-জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আছে সুলোচনার তা জানা ছিলনা অনুপম-অনুপমার। পাচিলের ওপাশে সুবর্ণ-ভিলায় সুলোচনার পরিত্রাহি চিৎকার শোনা যাচ্ছে। তার আর্ত-চিৎকারে আর সমবেত সমব্যথী আত্মীয়বর্গের কোলাহলে কান পাতা দায়। অনুপমার অনুরোধে পাচিলের ও পাশটায় উঁকিঝুঁকি মেরেও কিছুই দেখতে পেল না অনুপম। তাদের টিনের চালায় চড়ে ও পাশটায় নজর চালায় অনুপম। যা দেখে, দেখে যুগপৎ বিমর্ষ ও খুশীই হয় যেন। ঝটিতি নেমে এসে অনুপমাকে বলে—

— ঠিকই আছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

— কী দেখলে? আমাদের সুলোচনার গলা না?! কী হল ওর?

— হ্যাঁ। সুলোচনাই।

— আটকে রেখেছে ওকে? বেঁধে রেখেছে বুঝি?

— সুলোচনাকে বাঁধেনি, ওর পায়ে একটা বিশ কে.জি. বাটখাড়া বেঁধে রেখেছে। স্বর্ণকমল বাবুর ভারী আড়াইমণি ছেলেটি, পাথর না পাষাণ, কী যেন নাম ছেলেটির? নির্ঘাত ওর কাণ্ড।

— ওর নাম পার্থ। মানুষের নাম বিকৃত করা তোমার স্বভাব।

— যে আকৃতি! পার্থ-পাথর-পাষাণ একই কথা। যাক সুলোচনার এমনটি হবে জানতাম। পড়েছ যবনের হাতে, এখন টের পাবে যাদু। এমনই হয়...

— এমনই হয় বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে?

— কী করব?

— কী করবে মানে? এক্ষুণি ওদের বাড়ি যাও। গিয়ে বল, সুলোচনাকে ছেড়ে দিক। ওদের কি দয়ামায়া বলতে কিছু নেই?

— ওরা থোড়াই আমার কথা শুনবে! আমি কি থানার দারোগা? না কি পাড়ার গুণ্ডা, মহল্লার নেতা, না কি দেশের মন্ত্রী? আমার কথা ওরা শুনবে?

—স্বর্ণকমল বাবু, থুড়ি, মিঃ সেন, মিসেস সেনকে বল বেচারী সুলোচনাকে ছেড়েদিন।

— বললেই হল? দেখলামতো, স্বর্ণকমল-স্বর্ণলতাও বেশ তাড়িয়ে তারিয়ে ব্যাপারটা এনজয় করছে। সুলোচনার কষ্টে তারা মোটেই বিচলিত নয়।

— হায়! কী হবে এখন বলতো?!

— যা হবার তাই হবে... যবনের হাতে পড়েছে যখন, মরবে সুলোচনা। এটাই ভবিতব্য। জীবনানন্দ কী বলেছেন একটা কবিতায়...?

— সুলোচনার কথা?

— ওদেরই কথাতো... বলেননি—

চিলের সোনালী ডানা হয়ে গেছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝড়ে গেছে—
শালিকের নেই আর দেরী,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমুবে সে শিশিরের জলে। ...

— মরবে সুলোচনা; মরবে কানাকেষ্ঠও! দেখে নিও অনুপম! মরবে বেচারা কৃষ্ণের জীব কানাকেষ্টও...

— কোন্ দুঃখে মরবে কানাকেষ্ট?

— জীবন-সঙ্গীনী, ধর্মপত্নীর বিরহে মরবে না! সব্বাইতো আর আমার মতো পাষণ্ড নয়...

— মরবে কানাকেষ্ট!? ঐ দেখ স্বর্ণ-ভিলার ছাদের কার্ণিশে বসে কেমন রোদ পোহাচ্ছে, মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে। অথচ কেঁদেকেটে বুক ফেটে মরছে লাফাঙ্গা খঞ্জর খান। পাষণ্ড কানাকেষ্টর সামান্যতম প্রেম নেই, সহানুভূতি কষ্টবোধ নেই বেচারী সুলোচনার জন্য।

সুলোচনার বন্দী-দশা, তার আর্ত-চিৎকার, জীবন মরণ সমস্যা একটি ব্যাপার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল— সুলোচনা-কানাকেষ্ট-লাফাঙ্গা খান, এই ত্রিভুজ সম্পর্কের সরল সমাধান। অনুপমা-অনুপম কারো মনেই আর সন্দেহ রইল না সমব্যাথী, শোকাহত (এখন থেকে আর লাফাঙ্গা নয়) খঞ্জর

খানই সুলোচনার স্বামী বা আসল আদর্শ প্রেমিক। কানাকেষ্টই এখানে ভিলেন বা খলনায়ক। তরলমতি, লাস্যময়ী সুলোচনা, সে নিরপরাধ, তার জীবন বিপন্ন। সুবর্ণ-ভিলার হৃদয়হীন সোনার মানুষের হাতে সে আজ বন্দিনী। চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ নয়, তার জন্য যথেষ্ট সহমর্মিতা অনুপম-অনুপমার মতো আমাদেরও আছে— তবুও এটা অনুপম-অনুপমার নিজেদের পাকা সিদ্ধান্ত— সুলোচনা-কানাকেষ্টর সম্পর্কই অবৈধ। খঞ্জর খানই তার স্বামী। সুলোচনা, বড়জোর কানাকেষ্টর শালিকা হলেও হতে পারে। স্ত্রী নৈব নৈব চ।
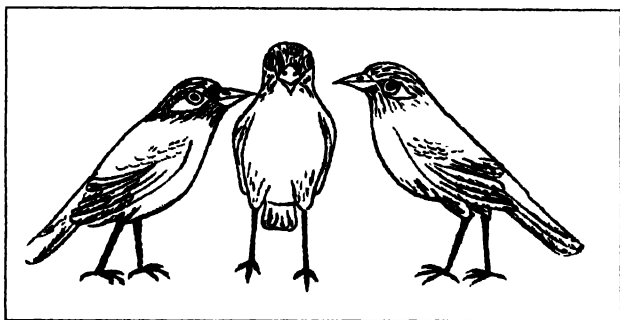
গ্রুপ-ফটোগ্রাফ।
বা-দিক থেকে প্রথম জন, শালিকা সুলোচনা, মাঝের জন
বেচারা কানাকেষ্ট ও একদম ডাইনে লাফাঙ্গা খঞ্জর খান।
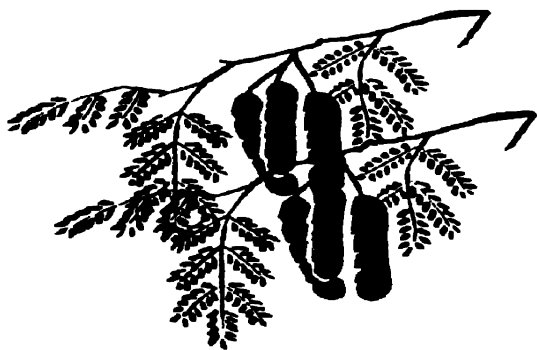
ব্যারামবিলাস

সতর্কীকরণ

মাননীয়া অনূঢ়া কুলীন বয়স্থাগণ,
যাঁহারা দিল্লীর লাড্ডু ভক্ষণ করেন নাই, কস্মিনকালে
করিবেনও না; স্থূল 'দেহ'রক্ষাই যাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান শুধু
পুরুষ মানুষই নয়, পুরুষ মশা, পুরুষ আরশোলা-
টিকটিকিও যাঁহাদের দুইচক্ষের বিষ সেই সকল
সাধিকারা **'ব্যারামবিলাস'** পড়িবেন না।

ব্যারামবিলাস

॥ এক ॥

Three-in-one
একাধারে ডক্টর, বৈদ্য ও মরীজ্

ডঃ মিস্ প্রীতিলতা বৈদ্য ওরফে কুমারী পৃথুলা বৈদ্য ওরফে শ্রীমতি হ্যাংলাথেরিয়াম্। কিঞ্চিৎ হ্যাংলা স্বভাবের জন্য বন্ধু ও পরিজন মহলে তিনি মিস্ হ্যাংলাথেরিয়াম্ নামেও সমধিক খ্যাত বা অখ্যাত। ডঃ মিস্ প্রমীলা বৈদ্য ওরফে শ্রীমতি কুমারী ক্ষীণাঙ্গী বৈদ্য ওরফে মিস্ গোমড়াথেরিয়াম্। কিঞ্চিৎ অধিক গোমড়া স্বভাবের জন্য পরিচিত মহলে তিনি গোমড়াথেরিয়াম্ নামেও সমধিক খ্যাত অথবা কুখ্যাত। সুখের কথা, ডঃ মিস্ পৃথুলা ও ডঃ মিস্ ক্ষীণাঙ্গী বৈদ্য, দুই সহোদরা দৃঢ়-কুমারী, সাদা বাংলায় Confirmed bachelor. প্রায় প্রৌঢ়া অথচ অনূঢ়া তাঁরা কেউই চিকিৎসক নন। অর্থাৎ বৈদ্য হয়েও তাঁরা কেউ বৈদ্য নন। তাঁরা ডক্টর হয়েও রুগিণী। বৈদ্য হয়েও মরীজ্। নশ্বর দেহে বিভিন্ন প্রকার ব্যারাম-বালাই-আধি-ব্যাধির চাষ, গবেষণা ও পরিচর্যা করেন।

গোড়াতেই সন্দেহবাদীদের সংশয় ও সন্দেহ নিরসন করে নেয়া ভালো। রামবিলাসের সাথে ব্যারামবিলাসের এক মাত্র ধ্বনিগত মিল ছাড়া, রাম কহো, আর কোন সাদৃশ্য নেই। নেহাত সরল ছা-পোষা মানুষ আমরা; বড়ো বড়ো মানুষজন নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করার মতো দুরভিসন্ধি ও বিলাসিতা আমাদের নেই। তবে বিলাস-ব্যসন, সে যে রকমই হোক, ভালো নয়। বিলাস বর্জন করাই শ্রেয়। ত্যাগ-তিতিক্ষায় আমরা গরীব-গুর্বো আমজনতা আজন্ম-লালিত— যত দুরবস্থা তত আমাদের ত্যাগের স্পৃহা। তবুও কিছু বিলাসিতা ত্যাগ করা যায় না। যেমন আরাম-বিলাসের মতোই এই 'ব্যারাম-বিলাস'। এটিও একটি চমৎকার বিলাসিতা।

'ব্যারামবিলাস' গল্পের দুই নায়িকা, যথা ডক্টর মিস্ প্রীতিলতা, ওরফে ডক্টর মিস্ পৃথুলা বৈদ্য ওরফে মিস্ হ্যাংলাথেরিয়াম্ এবং তাঁর সহোদরা ডক্টর মিস্

প্রমীলা বৈদ্য ওরফে ডক্টর মিস্ ক্ষীণাঙ্গী বৈদ্য ওরফে মিস্ গোমড়াথেরিয়াম্। এ সব জটিল নামাবলীর ঝামেলা এড়িয়ে আসুন আমরা একটু সামনে এগোই। আমাদের নায়িকারা ডক্টর এবং বৈদ্য হলেও তাঁরা কেউই চিকিৎসক নন। তাঁরা বিদ্যায় ডক্টর, বৃত্তিতে ডক্টর নন। আর 'পৃথুলা' ও 'ক্ষীণাঙ্গী' অভিধাগুলো হিংসুটে দুষ্টু লোকেদের দেয়া। মা-বাবা আদর করে দুই কন্যার নাম রেখেছিলেন প্রীতিলতা ও প্রমীলা যা আজ সরকারী নথীতে, মুদীর খাতায়, কাগজপত্রে আর সার্ভিস্ বুকেই আছে; কারো বুকে বা হৃদয়ে নেই।

মিস্ পৃথুলা বৈদ্য— না খেয়ে খেয়ে পৃথুলা আর মিস্ ক্ষীণাঙ্গী বৈদ্য শুধু খেয়ে খেয়েই ক্ষীণা। দুই সহোদরা, এক ঘরে বাস করেও তাঁরা পৃথগন্ন। যৌথ-কারবারে তাঁরা বিশ্বাসী নন। এক হাঁড়ির ভাত কী করে খাবেন! মিস্ ক্ষীণাঙ্গী যা প্রাতরাশ করেন, মিস্ পৃথুলার তা সাত দিনের খোরাক। স্থূলকায়া মিস্ পৃথুলার তিন মাসের লাঞ্চ ক্ষীণকায়া মিস্ ক্ষীণাঙ্গীর এক বেলার আহার। কাজে কাজেই এক হাঁড়িতে চলে না। 'Whose-whose, her-her' যার যার রোজগার, তার তার সংসার। শ্রীমতি পৃথুলা ও শ্রীমতি ক্ষীণাঙ্গী যদিও দুই সহোদরা, তাদের মধ্যে সহধর্ম বা সহাবস্থান-সহমর্মিতা খুব একটা নেই; প্রকারান্তরে আবার আছেও।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নাম শ্রীমতি পৃথুলা ও ক্ষীণাঙ্গী বৈদ্যের নামের সঙ্গে উচ্চারণ করা গর্হিত অপরাধ, সন্দেহ নেই। প্রথমোক্ত জন বিদ্যায়, জ্ঞানে গরীমায় রাজনীতি-কূটনীতি-দেশপ্রেম ও আরো বহুবিধ খ্যাতি অখ্যাতির শীর্ষে। এ স্থলে শ্রীমতি গান্ধীর নাম এ জন্যে আসছে যে শ্রীমতি গান্ধীর আমলে নির্বিচারে ব্যাঙ্ক ও নানান শিল্প-প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের মতো ঘটনাটি ঘটে। জাতীয়করণের ঘোরে অনেক বিজাতীয় প্রতিষ্ঠান, ঘাটের মড়া শিল্প-কারখানার মতো অনেক সিকি-আধুলীর ব্যাঙ্কও জাতীয় মর্যাদা লাভ করে। ফলস্বরূপ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং 'গজব ব্যাঙ্ক' একাসনে শোভা পায়। বিয়ের বাজারে, অনূঢ়া কন্যাদের পিতা-মাতার টার্গেট্ ব্যাঙ্ক-কর্মী ও ব্যাঙ্ক-অফিসারের মতো একপ্রকার লোভনীয় পণ্যের সৃষ্টি হয়। এখন অবশ্য বাজার মন্দা। ভাটার টানে আবার 'বিজাতীয়করণ'এর পালা চলছেতো।

রাজনীতির সেই সুবর্ণযুগে, ব্যাঙ্কগুলো ফেরৎ-অযোগ্য ঋণ-দান, ঋণ-সেবা, ঋণ-মেলা, ঋণ-খেলা ইত্যাদি ভেলকি ও করিশ্‌মা দেখিয়ে মানুষকে চিরঋণী করে রাখার জন্য মরীয়া হয়ে, খেয়ে না খেয়ে লক্ষ লক্ষ কেরানী-দপ্তরী নিয়োগ করত। তখনই এক মাহেন্দ্রক্ষণে, নিয়োগ পদ্বতির ফাক-ফোকর দিয়ে ডক্টর মিস্ পৃথুলা ও ডক্টর মিস্ ক্ষীণাঙ্গীরা একটি টিমটিমে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক'এ করনিক-বৃত্তিতে বহাল হন। সে প্রায় সিকি শতাব্দী হতে চলল। এখন আবার পালা বদলের সময়। জাতীয়-করণের খেলা শেষে এখন পরীক্ষামূলক জাতিচ্যুত-করণের গবেশা ও ভেলকিবাজি চলছে। এসব বিতর্ক ও জটিল কূটতত্ত্ব নয় আর। আমাদের উদ্দেশ্য গল্প শোনা। আমরা শ্রীমতি পৃথুলা ও শ্রীমতি ক্ষীণাঙ্গী দেবীদের গল্প শুনব। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীমতিরা এমনই দুটো টিম্‌টিমে ব্যাঙ্কএ কর্ম করেন। দুর্জনেরা বলে নৈষ্কর্ম-সাধনা তথা দিনগত পাপক্ষয় করেন।

আকার অবয়বের মতো প্রকৃতিতেও তাঁরা দুজনেই দুই মেরুতে বাস করেন। চিন্তা-ধ্যান-ধারণা ও মনন-মানসিকতায় তাঁদের মধ্যে ব্যাবধান দুস্তর। শুধু একটি ব্যাপারেই তাদের মিল। তারা দুজনেই ব্যারামবিলাসী। ব্যারাম-বালাই নিয়ে তাঁদের নিত্য করুক্ষেত্র, নিত্য রাবণ-বধ! ব্যারাম-বিলাসের গুরুত্ব আমরা শ্রীমতি পৃথুলা ও ক্ষীণাঙ্গী দেবীদের কথোপকথন থেকেই কিছুটা উপলব্ধি করতেপারব—

— দিদি, তোর কোমরের ঝুমঝুমি না ঝিঁঝিঁ ব্যাথাটা সেরে গেছে রে?

— কোমর?!

— হ্যাঁ, হ্যাঁ! কোমর! কোমর চিনিস না?

— এক কোমরে চিকশ ব্যাথা, অন্যটায় মিহি ব্যাথা! কোন্ কোমর?

— কোন্ কোমর মানে? কখানা কোমর তোর?

— আরে গাধা, কোমরের বাম দিক, না ডান দিক? বাম কোমর না ডান কোমর বলবি তো! মানুষের সব কিছুই দুটো করে। একটায় মানুষের খাই মিটে? দুটো হাত, দুটোপা, দুটো চোখ, দুটো কান, নাকের ফুটো সেও দুটো। মেয়েই বলিস আর ছেলেই বলিস, আরো যে কত কিছু, কত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সবই দুটো দুটো! কোমরও তাই। ডান-কোমর, বাম-কোমর। যার জন্য এখন ডান-কোমরের ডাক্তার

তোর বাম-কোমর দেখবে না! ডান-চোখের ডাক্তার তোর বা-চোখ দেখবে না। আরো কত ফ্যাকরা! একবার ব্যারাম একটা বাঁধাতে পারলেই টের পাওয়া যায়। আরে গাধা কোথাকার! গুছিয়ে প্রশ্ন করবি তো!

— আমি গাধা? বড়-বৌদির ভাই অনিমেষ, কী বলল সেদিন তোকে? এককালে তুই চাকরি পাবারপর অনিমেষদার পেছনে লেগেছিলি তুই? পাত্তা দিলি না ওকে। দিলে অবশ্য তোর একটা হিল্লে হয়ে যেত।

— হ্যসালি তুই! আমি পাত্তা দেব ওকে! ট্যাঁরা অনিমেষকে? আরে, সেইতো আমার পেছনে ছিঁনে-জোঁক, রাম-ডাশের মতো লেগে থাকত! তো, সেই শেয়াল-মুখো গবেটটা, উজবেকটা কী বলল তোকে? বলনা শুনি?

— আমাকে বলেনি। ওর বোন 'ডাইনীসারস' প্রতিমাকেই বলছিল, শুনলাম আমি। তার বোনকে ডেকে বলল, 'হ্যাঁ রে মিনি, তোদের বাড়ির সেই 'তিমিঙ্গিল'টা কোথায় রে?'

— তিমিঙ্গিল? সেটি আবার কী?

— তিমিঙ্গিল চিনিস না?

— বললামতো, চিনিনা! কী বস্তু সেটা? খায় না কি মাথায় মাখে?

— আস্ত তিমি গিলে খায় যে সেই তিমিঙ্গিল। সে তোর সুকুমারীয় 'হাতিমি'র ঠাকুরদা বলতে পারিস!

— যত্ত আবোলতাবোল কথা! 'হাতিমি'! সেটি আবার কী বস্তু?

— বস্তু নয়, প্রাণী। সুকুমারীয় 'আবোলতাবোল' পড়িসনিতো! তুই কী বুঝবি? হাতিমি, বিছাগল, গিরগিটিয়া, সিংহরিণদের কথা সেই কোন মেয়েবেলায় পড়েছি! আজ এই নারীবেলা গড়িয়ে বুড়িবেলায়ও দেখ কেমন দিব্যি মনে আছে—

হাতিমির দশা দেখ: তিমি বলে, জলে যাই।
হাতি বলে, এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।

সঙ্কর জাতীয় জীব যত! ধরে-মুড়োয় সন্ধি করে না কি এ সব জীব জন্মায়। হাতি যোগ তিমি, পেয়ে যাবি হাতিমি! সাহেবরা ইংরেজীতে বোধ হয় Whale + elephant = Whalephant বলে।

যত্ত সব রাক্ষুসে প্রাণী। ভাবতে পারিস? আস্ত তিমিটাই নাকি গিলে খেতে পারে প্রাণীটা। তিমিকে গিলে খায় বলেই না বলেই তিমিঙ্গিল! বুঝলি না?

— আচ্ছা! তো, আমাকে তিমিঙ্গিল বলল শালা অনিমেষ! আমি তিমিঙ্গিল যদি তবে সে তিমিঙ্গিলের ভাগনে বৌ। মিসেস্ তিমিঙ্গিল...

— তুইই তাহলে তিমিঙ্গিলের ভাগনে? হি-হি-হি!

— রাখ তোর 'তিমিঙ্গিল'? সত্যি সত্যিই এমন আজব প্রাণী আছে?

— আছে বোধ হয়! হাতিমিঙ্গিলও নাকি আছে! হাতিমিঙ্গিল চিনিস না? হাতি আর তিমিঙ্গিল দুটোকেই গিলে খেতে পারে যে প্রাণী সেটাই নাকি হাতিমিঙ্গিল! অনিমেষদা তোকে 'হাতিমিঙ্গিল' বলেনি অবশ্য। অনিমেষই বলেছে, এসব হাতিমিঙ্গিল আর তিমিঙ্গিল আরব সাগর না প্রশান্ত মহাসাগর কোথায় যেন পাওয়া যায়। নারায়ণ গাঙ্গুলী, না কি প্রেমেন মিত্তির কার বইতে যেন আছেও এই জীবটির কথা! ঘানাদা না টেনিদা কে যেন দেখেছেও... নাকি তোকেই ওরা কোথাও দেখল কে জানে! তিমিদের ধরে ধরে খেয়ে সাফ করে ফেলছে নাকি! Timi & Timingil Research Programme না কি International Whale & Whalingil Research Programme বলে কি যেন একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার-স্যাপার আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের World Health Organisation'এর কী একটা আপিস আছে না যারা তিমিদের health নিয়ে ভাবে। আজকাল বিদেশীরা হাতি-ঘোড়া, বাঘ-ভালুক, কুমীর-কামট, তিমি-মকর এসব নিয়ে খুব আদেখলামো করে তো! অনেক বড়ো বড়ো আপিস খুলেছে এ সব প্রাণীর জন্য। অনিমেষ নাকি ওটাতেই চাকরি করে; সেই কোন মুল্লুক জিব্রালটার, জিম্বাবোয়ে, জাম্বিয়া না মোজাম্বিক কোথায় যেন পোস্টিং হয়েছে ওর।

— আমি 'তিমিঙ্গিল'? শালার পো শালা অনিমেষ! তিমিঙ্গিল বলে অপমান করল আমাকে! আমি তিমিঙ্গিল! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! অনিমেষটাতো একটা উজবেক! গাধার ভায়রাভাই অশ্বতর!

— অশ্বতর কী রে?

— অশ্বতর মানে গাধার বর্ণ-সঙ্কর। অশ্ব যোগ ইতর, অশ্বতর। অর্থাৎ খচ্চর। অনিমেষটা একটা আস্ত অশ্বতর, ওর ঠাকুরদা ছিল আরবী ছিল ঘোড়া।

— ছি! মুখ খারাপ করিস না। এ জন্যেইতো তোর পাত্রপক্ষ তিন তিন বার ফিরে গেল, বিয়ে হল না তোর! শালা না বলে সম্বন্ধী বলতে পারিস।

— সম্বন্ধী কী আবার?

— শালার মার্জিত সংস্করণই সম্বন্ধী। এতোটা খারাপ শোনায় না, অথচ আঘাতটাও একেবারে মোক্ষম!

— মনে রইল। শালা কৃষ্ণমূর্ত্তিকে 'সম্বন্ধী' বলতে হবে এখন থেকে।

— তা না হয় বলিস। তোর ডান-কোমরটার খবর কী?

— যন্ত্রণাটা ডান দিক থেকে বাদিকে এসেছে ইদানিং। মুশকিলটা কী জানিস, যখন বা-কোমরের ডাক্তারের কাছে যাই, বজ্জাত ব্যাথাটা ডান-কোমরে চলে যায়! আর ডান-কোমরের ডাক্তারের কাছে গেলে... ডায়নামিক ব্যাথাটা...

— ডান-কোমর ছেড়ে বা-কোমরে আসে... তা, কাকে দেখিয়েছিস?

— সবাইকে বুঝি ডেকে ডেকে দেখানো যায়?

— না, না। সে দেখানোর কথা বলছি না। বোকা কোথাকার! ডাক্তারতো দেখাচ্ছিস! কাকে দেখাচ্ছিস?

— ডাঃ অমিতাভকে দেখাব ভাবছি...

— ডাঃ অমিতাভ! অমিতাভের পদবী কী? বাঙ্গালীতো, বয়স কত রে? বাঃ! চমৎকার নাম তো?

— ডাক্তারের নামই আসল। জবরদস্ত ডাক্তারের নামও জবরদস্ত হয়।

— নামের ঠেলাতেই ব্যারাম সারে বলতে চাস?

— তাই তো! যেমন ধর, ডক্টর চেস্টোফার চেস্টারউড্ (লণ্ডন), চেষ্টের অর্থাৎ বুকের ডাক্তার; তারপর ডক্টর ক্যাপ্টেন্ ষ্ট্রংগাষ্টিয়ান্ ষ্ট্রঙ্গোল্যাস্ ষ্টিভাও...

— বাবা! যত ষ্ট্রংম্যান, আইরন্‌ম্যান! গোবর গামা, মহম্মদ আলী আর তেলিয়ামুড়ার পালোয়ান স্বর্গীয় মহানন্দ মালের ডাক্তার বুঝি?

— হ্যাঁ। প্রায় তাই। ডঃ ষ্টিভাও মিলিটারীর ডাক্তার। আরো আছে, ডক্টর ভ্লাদিমির মক্ষীচুস্কু হাড়কঞ্জুস্‌কভ্ (মস্কো)।

— ডক্টর মক্ষীচুস্! মানে হাড় কিপ্টে! কৃপণের হদ্দ ডাক্তার?

— আরে না! তা হবে কেন? রাশিয়ানদের নাম এমনই হয়। রাশিয়াশ্রী

ডক্টর ভ. ম. হাড়কঞ্জুস্‌কভ্ হলেন একজন ডাকসাইটে হাড়ের ডাক্তার। তাঁর নামেই নাকি ভাঙ্গা হাড় জোড়া লেগে যায়! রাশিয়াও ভাঙতে ভাঙতে টিকে আছে শুধু তাঁর নামের জোড়েই। তার পর, ডক্টর মির্জা সৈয়দ কওসর্ উদ্দিন আন্‌সারী, ক্যান্সারের ডাক্তার; ডক্টর হার্টবার্ণ হ্যারিংটন্ (ওয়াশিংটন), হার্টের ডাক্তার।

— কোথায় পেলি এতো এতো ডাক্তারের ঠিকুজী-কুলুজী?

— শীলাদির স্টকে আরো কতো আছে! ডক্টর পি.পি.ভি.কে. অমিতাভ...

— পুরো নামটা কী রে?

— পুরো নামটা ঠিক মনে নেই আমার। শীলাদি যেন বলছিল, পুরুষোত্তম পদ্মনাভন ভিরুচ্চিরাপল্লী কুট্টায়াম্ অমিতাভ। এরকমই জবরদস্ত একটা কিছু।

— ও রে ব্বাবা! এ যে দেখছি বারো হাত কাঁকুড়ের আঠারো হাত বিচি!

— যেমন নাম, তেমন ডাক্তার। খুব নামডাকতো। তবে ডঃ অমিতাভ খুব হ্যাণ্ডসাম। আর বয়স! ডাক্তারদের বয়স ধরা যায় না রে।

— সাজগোজ করে বয়স লুকিয়ে রাখে সবাই?

— শুধু তাই না! নামী কোম্পানীর ভাল ভাল আসল অষুধ আর রাজ্যের যত স্যাম্পল টনিক-ফনিক খেয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখে সব বেটারা!

— ডঃ অমিতাভ খুব সুন্দর ডাক্তার বুঝি? শুধু সুন্দরীদের ডাক্তার নয় তো আবার!? শুধু কোমরের ডাক্তার? পা টা দেখেন না? পা ছাড়া...

— পা!!

— হ্যাঁ রে! পা, মানে লেগ্। পায়ের পাতা, গোড়ালী বা হাটু, মালাইচাকি? তার নীচের বা উপরের দিকের দুর্গম জটিল স্থান? যতটুকু দর্শনীয় বা প্রদর্শনীয়!

— ছিঃ! একজন হ্যাণ্ডসাম ডাক্তার দেখবেন পা?

— কেন, দেখতে পারেন না? পা বুঝি একেবারে ফেলনা?

— কী মূল্য আছে তোর পায়ের?

— পায়ের কোন দাম নেই বলতে চাস? একবার পা ভেঙ্গে ক্র্যাচ্ নিয়ে হাটলি ছ'মাস। মনে নেই? বাবা লোকনাথ! পা'কে অবহেলা করলে ধর্মে সইবে না। পা দেখাচ্ছিই আমি ওঁকে! পায়ে কী এক জটিল ব্যারাম! কী যে কষ্ট আমার...

— ছিঃ! পা দেখাচ্ছিস তুই ডঃ অমিতাভকে?

— পা দেখালাম কোথায়? জানতে চাইছি ওনি দেখেন কিনা?

— হয়ত দেখেন। কিন্তু তোর আবার তেমন পা কোথায়...

— কেন, আমি কি হামাগুড়ি দিয়ে চলি? আমি ল্যাংড়ী?

— তা ঠিক নয়, তবে তোর পায়ের যা ছিরি-ছাদ!

— ছিরি যাই হোক,পা তো! নিন্দে করসি কেন? বিনা কারণে নিন্দে করলে বাবা লোকনাথ তোর বিচার করবেন। কেন ডক্টর অমিতাভ পায়ের কষ্টটা বুঝবেন না? ব্যারামটার চিকিৎসা করবেন না? চিকিৎসা করা ডাক্তারের ধর্ম না? কেন, দেখবেন না কেন শুনি? পয়সা দেব না আমি?

— কোন দুঃখে পা দেখবেন অমিতাভ! কোমরই দেখেন না সবটা।

— মানে? আধা কোমর দেখেই প্যাশাণ্ট ছেড়ে দেন?

— তা ঠিক নয়! শুধু বা-কোমড় দেখেন উনি।

— শুধু বা-কোমর? ডান-কোমরের কী দোষ?

— ডান কোমরের জন্য ডঃ পুরীকে রেফার করেন আবার।

— পুরীতে রেফার করে? আসা যাওয়ার খরচ দেয় কে?

— পুরীতে না। ডঃ পুরীর কাছে, মানে ডঃ পর্‌বরিশ্‌ পুরীর চেম্বারে!

— তা হলে পা দেখবেন না অমিতাভ?

— কোমরের নীচে কিছু দেখেন না। তুই যদি পিঠ বা ঘাড়-টার দেখাতে চাস সে অন্য কথা। অবশ্য যদি তোর চর্মরোগ, নক্সী-দাদ বা ছুঁলি-টুলি না থাকে! সাবধান ওকে পা দেখাতে যাস নে যেন। তোর পায়ের যা চেহারা! মাগো! খেজুর গাছের মতো, কাঁটাকুটি! সুন্দরবনের কামট-কুমীরের পায়ের মতো তোর এমন বিচ্ছিরি পা! আর ডঃ অমিতাভ যদি জানতে পারেন তুই আমার বোন... মাগো!...

— আমার পা বিচ্ছিরি ফুটি-ফাটা? তোর পা বুঝি পদ্মকোরক লক্ষ্মীর পা! ভালো কথা, ডাঃ অমিতাভ তোর কোমর দেখতে পারবেন? নাগাল পাবেন?

— কেন পাবেন না রে?

— বলছিলাম কি, তোর যা একখান আগা-পাশ-তলা বেঢপ পিপের মতো গিরি-গোবর্দ্ধন আকৃতি, কোমর বলে আলাদা তোর কিছু আর আছে কি?

— তুই গায় পড়ে ঝগড়া করছিস! জানি, তুই কী পা দেখাবি! পা বলতে

তো তোর সেই একজোড়া রঘু ডাকাতের বাহন পাকা বাঁশের 'রণপা'। হাড়গিলে হাড়িচাঁচার লম্বা ঠ্যাং... বাগদা-গলদা চিংড়ি আর লাল-কাঁকড়ার দাঁড়া!

— তুই আমাকে হাড়গিলে, বাগদা-গলদা চিংড়ি বললি? জানিস তোর ব্যাঙ্কের অনুপম তোকে কী বলে চেনাচ্ছিল একজনকে? বলছিল... হি-হি-হি...

— হি-হি না করে লোকটা কী বলছিল সাহস থাকলে বল শুনি...

— বলছিল তুই নাকি একটা আস্ত সিন্ধুঘোটক। হিপোপোটামেসো না হিপোপোটামাসি, হিপোর মাসি, জলখাসী।

— মুর্খ, তোর মাথা! সিন্ধুঘোটক নয় জলহস্তীকে হিপোপোটামাস বলে। হিপোপোটামাসি আবার কী?

— হ্যাঁ কথাটা মনে আসছিল না কিছুতেই। এতো কি আর জানি! ভাবছিলাম হিপোপোটামাস'এর ফেমিনিন জেণ্ডারই বুঝি হিপোপোটামাসি।

— হিপোপোটামাস না হাতি! জবরজং একটা বললেই হল! ঝগড়া করে কাজ নেই আর! তুই যাবিতো আমার সঙ্গে? একা একা আজকাল ডাক্তারখানা আর নার্সিং-হোমের মতো ভয়ঙ্কর স্থানে যেতে নেই। পদে পদে কত যে বিপদ!...

— ঠিকই বলেছিস। কাগজে প্রায়ই পড়ি। 'চিকিৎসক কর্তৃক জনৈকা রুগীনীর শ্লিলতাহানি, গ্রেপ্তার এক'। অথবা 'নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন রুগীনীর প্রতি ভুয়ো চিকিৎসকের কু-প্রস্তাব, চিকিৎসক প্রহৃত - ভাঙচুর!' পড়িস না এসব?

— কু-প্রস্তাবটা কী রকম রে?

— কু-প্রস্তাব যখন সেতো খুব খারাপই বোধ হয়। কাগজে এতটা ডিটেলস্ লেখে না তো! কী করে বলব... বেটারা শুধু লেখে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ হ্যান-ত্যান। আসল কু-প্রস্তাবটার পাশ কাটিয়ে যায়। নিজেদের, মানে 'নিজস্ব সংবাদদাতা' থাকলে আসল ঘটনাটা জানা যেত। খবরে কু-প্রস্তাবের বয়ানটা বা আসল প্রস্তাবটারই উল্লেখ থাকে না। যত্তসব রাবিশ! আমি এর বেশী জানি না রে...

— তোর সেই 'ইয়ে'... মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে জিজ্ঞেস করিসতো!

— আমার 'ইয়ে' মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি? ঠেস্ দিয়ে কথা বলছিস যে বড়ো! এই রাত দুপুরে ঝগড়া করতে চাস বুঝি? তোর ভাবখানা যেন আমি ওর বিয়ে করা বৌ রাধামূর্ত্তি, সরি, মিসেস্ কৃষ্ণমূর্ত্তি, তাই না?

— এটা তোর উইক্‌নেস্‌। কথায় বলে না, ঠাকুর ঘরে কে রে...

— হ্যাঁ, উইক্‌নেস্‌তো বটেই! আমি যদি ওকে একটু প্রশ্রয় না দিই, আমাকে এমন সেকসনে পোষ্টিং দেবে! আর আমার যা বিদ্যে, চাকরি করে ভাত খেতে হবে না। এর চে্য এটা ভালো না? আজ তিন বছর ধরে শুধু ফর্ম বিলি করি কাউন্টারের বাইরে বসে বসে। ঘুমুতেও পারি যদি ঘুম পায়,যখন খুশী! নে, খুব হয়েছে! এখন কাজের কথা বল। বলনা কু-প্রস্তাবটা কি রকম!

— আগে শীলাদিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই... কু-প্রস্তাবটা অনেকটা শ্লিলতাহানির প্রথম ধাপ বলেই মনে হয়। হ্যাঁরে দিদি, শ্লিলতাহানির বয়স কত পর্যন্ত রে? তোর বোধ হয় পেরিয়ে গেছে? না? আমারই ভাবনা হয় বেশী। এই পোড়ো বাড়ি, ভূতের বড়িতে থাকি! রাত-বিরেতে কখন যে কী হয়! দুটো ভাড়াটে বসাতে হবে চালতা গাছের ওদিকে গা-ছম্‌ছম্‌ অন্ধকার দিকটায়...

— তুই বসা গে ভাড়াটে! দেখবি ভাড়াটেই একদিন তোর শ্লিলতাহানি করবে। ভাড়াটে গুণ্ডার কথা পড়িস না কাগজে?

— ভাড়াটে গুণ্ডা! আরে, ভাড়াটে গুণ্ডাতো অন্য রকম!

— অন্য রকম আবার কী? ভাড়াটে কি গুণ্ডা হতে পারে না? গুণ্ডা যেমন ভাড়া করে আনা যায়, ভাড়াটে হিসেবেওতো যেচে নিজেই গুণ্ডা আনা যায়! যায় না?

— কী যে বলিস না তুই মাথামুণ্ডু তার ঠিক নেই! গুণ্ডা-ভাড়াটে আর তোর ভাড়াটে-গুণ্ডা এক হল?

— এক হোক আর নাই হোক! আমি বাবা ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই। এই বয়সে একটা কিছু হলে... শ্লিলতাহানির আবার বয়স!? ভাবিস না, তুই দু'বছরের ছোট হলেও তোর যা শাকচুন্নীর খ্যাংড়াকাটি ফিগার! তোর শ্লিলতাহানি করার মতো অশ্লিল কাজ কেউ করবে না। ভাবনা হয় আমার রে!

— তোর আবার ভাবনা! যা একখানা গন্ধমাদন বপু তোর!

— ভাবনা হবে না? ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কৃষ্ণমূর্ত্তিটা মহা বজ্জাৎ! আমাকে বলে, 'মিস্‌ পৃথুলতা, সরি, মিস্‌ প্রীতিলতাদেবী, ব্যচিলর মানুষ, এতো সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কী করবেন? অভারটাইম করুন না? গল্পও করা যাবে...' তা

পীরের সঙ্গে মামদোবাজী! আমি কি বুঝি না ওর বদ-মতলবটা? তো যদি...

— আরে না, ও সব কিছু নয়। কৃষ্ণমূর্ত্তি মানুষ খারাপ নয় রে। ও কি তোর বয়-ফ্রেণ্ড হতে পারে না?

— আধ-বুড়ো বয়-ফ্রেণ্ড? ম্যান্-ফ্রেণ্ড বল। ও কি বাচ্চা ছেলে যে বয়-ফ্রেণ্ড হবে কারো? এসব গাঁজাখুরী কথা বাদ দে! আসল কাজের কথা বল। ডঃ অমিতাভর ভিজিট কত রে?

— ষাট টাকা বোধ হয়।

— ষাট টাকা?! রামচন্দ্র! বলিস কী?

— কেন, খুব বেশী হল বুঝি?

— বেশী কী বলছিস! ষাট টাকা ভিজিটের ডাক্তার দেখালে ইজ্জত থাকবে আমাদের? আমরা কি কলোনীর কানা সুবলের মা'র মতো হয়ে গেলাম!

— কানা সুবলের মা নয়! সুবলের কানা মা। তা কেন হব?

— একই কথা, তোর কানা সুবলের মা আর সুবলের কানা মা। ঐ সুবলের মা নাকি ষাট টাকা ভিজিটের ডাক্তার দেখায়। কোথাকার কোন হাতুড়ে বদ্যি, কোয়াক্ ডাক্তার। আজকাল চার-পাঁচশ টাকার কম ভিজিটের ডাক্তার দেখালে মানুষ করুণার চোখে দেখবে...

— তো, ডঃ অমিতাভকে আমরা একশো টাকা ভিজিট দেব না হয়... ষাট নিতে পারলে একশো নিতে আপত্তি হবে না তাঁর।

— ফুঃ ! একশো টাকাতো আমাদের টিংকুর ফি!

— টিংকু!

— হ্যাঁ রে! বুলাদির দেবর! দাড়িও গজায় নি ওর। এইতো সেদিন মাত্র ডাক্তারি পাশ করে এল না... আনাড়ির মতো প্রেস্ক্রিপশন্ লেখে...

— তা হলে ডঃ অমিতাভকে দুশো টাকা ভিজিট দেব! তবুও তাঁকে দেখাব আমরা! শীলাদির সাথে একদিন গিয়েই ডাক্তার আমার পছন্দ হয়ে গেছে। আর আমার যখন পছন্দ, তোরও অপছন্দ হবে না দেখিস।

— কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। মানুষ আজকাল ডাক্তারদের হাঁড়ির খবর রাখে! নূতন ডাক্তার ডাঃ অমিতাভ'র ভিজিট দুশো টাকা আবার বেশী হয়ে

গেল না তো? হোক গে! ডাক্তারকে যখন আমাদের পছন্দ...

— না না। ঠিক আছে। আমরা দুশো টাকাই দেব।

— ডাক্তার নেবে বেশী ভিজিট?

— না নিলে শুধু মানি-রিসিট্ নেব ডাক্তারের কাছ থেকে...কম পয়সার ডাক্তার দেখিয়েছি কেউ সন্দেহ করলে মানি-রিসিট্ দেখাব।

ব্যারাম-বিলাসিতার পরিণতি বৈদ্য-বিলাসিতা। নাসিকা-কর্ণ ও কণ্ঠ বিশেষজ্ঞ বা শুধু নাক-কান-গলার বৈদ্যকে দোষ দিই না আমরা। রুগী বা মরীজের নাক-কান-গলা এই তিনটিই বৈদ্য মাত্রেরই লোভনীয়। এ তিনটিই কর্তনের যোগ্য। তালেবর, এলেমদার অশ্বিনীকুমারদের হাতযশ, নামের শেষে ইংরেজী বর্ণমালার সমাহার, বিজাতীয় যন্ত্রপাতি ও কায়দা-কানুনের উপর নির্ভর করে কী পদ্ধতিতে তাঁরা আপনার নাক-কান-গলা কাটবেন। তবে নাক-কান কাটার চেয়ে গলা কাটার দিকেই কৃতবিদ্য বৈদ্যদের নজর থাকে বেশী। বৈদ্য চিনতে ভুল করলে ডিগ্রীধারী কোয়াকের হাতে মরীজের নাক কাটা যায়। বৈদ্যে বৈদ্যে বিবাদে মরীজের কান কাটা যায়। আর গলা কাটতে সবাই পারঙ্গম। 'শতমারি ভবেৎ বৈদ্য' সত্য, তেমনি এটাও সত্য সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রণামী না দিলে ব্যারাম-বিলাসের নজীর, চুরান্তপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয় না।

তিন্তিড়ী

॥দুই॥

Elephantiasis, Hosrsentiasis
শ্লীপদের বিপদ ও John Disease

শ্রীমতি পৃথুলাদেবী ও শ্রীমতি ক্ষিণাঙ্গীদেবী যে দুটো ব্যাঙ্কএ কর্ম করেন তার একটি 'ভারতীয় কল্পতরু ব্যাঙ্ক', অন্যটি 'রাষ্ট্রীয় প্রগতি ব্যাঙ্ক'। কল্পতরু ব্যাঙ্ক অর্থাৎ যে ব্যাঙ্কের কাছে চালাক-চতুর-খলিফা পাবলিক যা চায় তাই পায়, উপুরহস্ত করতে হয় না, ফেরৎ দিতে হয় না। আর প্রগতি ব্যাঙ্ক, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উৎস তথা রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে মুক্তহস্তে অঢেল ঋণদান করে; ঋণ আদায় উশুল করাকে প্রগতি বিরোধিতা মনে করে। কোন বোকা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে এলে তাকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করে। এমনই দুটো ডাকসাইটে ব্যাঙ্কএ কর্ম করেন আমাদের শ্রীমতি পৃথুলতা ও ক্ষীণাঙ্গী-দেবীরা।

এজন্যে আমাদের কোন দুঃখ নেই ।আমাদের দুঃখ সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি,গুরুতর কর্মের শেষে রিক্সা দরদাম করতে করতে গুটি গুটি হেঁটেই বাড়ি আসতে হয় তাঁদের। এই ছোট শহরের প্রায় সব রিক্সাওয়ালারা শ্রীমতি পৃথুলাদেবী ও ক্ষীণাঙ্গী দেবীকে ভালো করেই চেনে। ওজনের তুলনায় যৎসামান্য ভাড়া দিতেও তাঁরা অযথা ঝামেলা পাকিয়ে রিক্সাওয়ালার কিম্‌তি টাইমের অপচয় করেন। তাঁরা ধীর-মন্থর গতিতে বাড়ি চলে আসেন। অতি সামান্যতম গৃহকর্মাদি সেরে আবার যথারীতি ব্যারাম-বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পড়েন। বিজলীর খরচ বাঁচাতে শ্রীমতি ব্যারাম-বিলাসিনীরা সন্ধ্যেয় সন্ধ্যেয় শুয়ে পড়ে ব্যারাম-বিলাসী গল্প করেন—

— দিদি, তা হলে চল যাই কাল সকালেই।

— কোথায়?

— কোথায় আবার! ডঃ অমিতাভ'র চেম্বারে আর কি! ইশ্‌! পায়ের ব্যাথাটাই বোধ হয় কোমরে চড়ল গিয়ে... এবার মুক্তহস্তে কিছু দান-টান করতে হয় রে। কখন যে টেঁসে যাই! পূণ্য-টুণ্য কিছু করব ভাবছি ... মাগো! রক্ষেকালী! শালার পৃথিবীটা রোগ বালাই আধিব্যাধি-ব্যারামে গিজ্‌-গিজ্‌ করছে রে!

— ঠিকই বলেছিস! আমার অবস্থা দেখ। এই পদযুগল নিয়ে যে আবার কী ব্যারাম বাঁধিয়ে বসেছি ঈশ্বর জানে! বাবা লোকনাথ! তোমার পাদুকা উৎসবে দুটো অচল টাকা দিয়েছিলম! এখন এই পদ-যুগল নিয়ে আবার ভুগে মরব।

— কী যে পাদপদ্ম পদযুগল তোর! ডুবুরির পায়ের প্যাডেলের মতো পা। প্ল্যাটিপাসের পা, হাতিমির ঠ্যাং। তোর ওগুলো পদ নয় রে! রীতিমতো শ্লীপদ!

— হ্যাঁ রে! প্রমী শ্লীপদটা কী? তুই জানিস? ঠিক ঠিক অর্থ জানিস? মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি বলছিল আমাকে সেদিন আমাদের ক্যান্টিনে।

— শ্লীপদের কথা? কী বলছিল?

— বলছিল কি, মিস্ পৃথুলতা, থুক্কু, মিস্ প্রীতিলতা, আপনার শ্রীপদ, থুক্কু, শ্লীপদ জোড়াটা একটু নামিয়ে বসুন। ইট্ লুকস্ ভেরী ভেরী অড্!

— তোর যা বাজে অভ্যেস! পা তুলে না বসলে চলেনা তোর!

— তো, শোন না! কথাটা শুনে সবাই খুব হাসাহাসি করল... আজ আবার তুই বললি শ্লীপদ... তো শ্লীপদটা কী রে? শ্লীপদ না শ্রীপদ? না পদশ্রী? নামী জুতোর দোকান হবে বোধ হয়। তাই না?

— তোর মাথা! হায়! তুই এই বিদ্যে নিয়ে একটা ন্যাশ্নালাইজড্ ব্যাঙ্কএ চাকরি করিস! ভাগ্যিস অনিমেষদার খাতা টুকলীফাই করতে পেরেছিলি। শুধু টিক্-মার্ক আর ক্রশচিহ্ন রাইটচিহ্ন দেয়া তো! দিব্যি উৎরে গেলি পরের ঘাড়ে ভর করে। অথচ অনিমেষদাকে বিয়ে করলি না। বেচারা তোর জন্য বিবাগী হয়ে গেল শেষতক। তোদের মতো স্টাফের জন্যই ব্যাঙ্কগুলোর এই অবস্থা আজ। আবার সব প্রাইভেট হচ্ছে। মহাজনের গদীতে চাকরি করো আবার! তোদের...

— বেশী ভ্যান্তারা করিস না! তোর ডক্টরেট ডিগ্রী খানা কী করে নিয়েছিলি জানি না? কী থিসিস্ লিখেছিস তুই? সবতো প্রফেসর ফকরউদ্দিন স্যারের লেখা। ফকরউদ্দিন স্যার এমনি এমনি তোকে ডক্টরেট বানিয়ে দিল? না দেয় কখনো, পাবলিক জানে না? তোর কথায়, এই বস্তাপচা ডক্টরেট নিতে গিয়ে আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের এক কাঁড়ি টাকা বেরিয়ে গেল। এখন এই ডক্টরেট বেচতে গেলে পাঁচ টাকা দিয়েও রামখিলাওন, ছগনলালও নেবে না! মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি বলে এসব ডক্টরেট নাকি আজকাল বাড়ির ঝি-চাকরানিরাও নিতে চায় না।

— যথেষ্ট হয়েছে চুপ করতো! তখনতো কত করে বললি, সবাই মুর্খ বলে। ডক্টরেটটা নিয়ে নিই। মুর্খদের মুখর উপর জবাব দেব...

— বাজে বকিস না! তাহলে সব তথ্য ফাঁস করে দেব। কতগুলো টাকা গেল আমার! অথচ তোর এক পয়সা খরচ হয়নি। ফকর-উদ্দিন স্যার এমনি এমনি তোর উপকার করল! বুঝি না আমি কিছু? যাক, ধানাই পানাই না করে বলতো শ্লীপদ মানেটা কী! যদি খারাপ কিছু হয় তো শালা কৃষ্ণমূর্ত্তির খড়িসের বিষ ঝেড়ে নামাব আমি... আমার নাম প্রীতিলতা।

— শ্লীপদ তো খুব খারাপ রে! কঠিন ব্যারাম। চিকিচ্চে নেইই ভারতে। হাতির দেশ হাতিওপিয়া না জানি ইথিওপিয়া, কী যেন একটা দেশ আছে! সেই আফ্রিকায় যেতে হবে তোকে ডাক্তার দেখাতে। শ্লীপদ হল তোর ভয়ঙ্কর ব্যারাম Elephantiasis 'হাতিরোগ' বলতে পারিস। হাতির পায়ের মতো, গথিক্ প্যাটার্নের পুরনো দালান বাড়ির থামের মতো গোদা গোদা পা হবে তোর!

— সব্বোনাশ! কী বলছিস?

— হ্যাঁ। শ্লীপদ, মানে পায়ে গোদ হলে পাগুলো হাতির পায়ের মতো ফুলে যায়। তোর কি পা ফুলোফুলো মনে হয় ইদানিং? এটাইতো হাতিরোগ...

— হাতিরোগ! ওরে ব্বাবা! আজব ব্যারাম। হাতিরোগের কথা শুনিনিতো সাত জন্মেও। ঘোড়ারোগের কথা শুনেছি অবশ্য...

— গরীবের হয়, শুনেছি আমিও। গরীবের ঘোড়ারোগ। Horsentiasis, Indian Virus তার মানে HIV না কী যেন বলে আজকাল সংক্ষেপে ডাক্তারি পরিভাষায়। রোগটা নাকি ভারতেই বেশী হয়। তবে হাতিরোগ খাতির করে না কাউকেই। গরীব, বড়লোক, ছোটলোক, মেজোলোক সবারই হতে পারে।

— আমার পা তো সব সময়ই ফোলা। মেয়েবেলা থেকেই আমার এরকম। যুবতিবেলায়ও এমনই আছে। ঠাকুর! ভবিষ্যতে বুড়িবেলায় হয়তো আরো খারাপ হবে। দাঁড়া, বেড স্যুইচ্‌টা দেতো! দেখি পা-জোড়াটা একবার ভালো করে। হ্যাঁরে, বেশ ফুলো-ফুলোইতো মনে হচ্ছে! না? দেখতো একটু টিপে টুপে, দেখ না? বেরিবেরির লক্ষণ না তো?

— হতেও পারে!

—সব্বোনাশ! বেরিবেরি হলে নাকি আবার দুবেলা ঢেঁকি-ছাটা চালের ভাত খেতে হয়! আজীবন নুন ছাড়া হবিষ্যান্ন খেতে হয়!

— কিন্তু ঢেঁকি-ছাটা চাল কি দেশে আছে? ঢেঁকিই নেই ভূ-ভারতে! কোথায় পাবি ঢেঁকি-ছাটা চাল? না খেয়ে মরতে হবে তোকে!

— বাড়িতে আবার নারদের টর্পেডো ঢেঁকি বসাতে হবে!

— তা না হয় বসালি! ঢেঁকিতে ধান কুটবে কে?

— আমি কুটব! কানা সুবলের মায়ের কাছ থেকে শিখে নেব!

— আশানন্দ ঢেঁকীর মতো বিশ-মণি বপু নিয়ে ঢেঁকীর তালে নাচবি?

— আশানন্দ ঢেঁকী! এটি আবার কে রে?

— মুর্শীদাবাদ না বীরভূমের কোন বীর ছিল আশানন্দ ঢেঁকী। দুহাতে ঢেঁকী তুলে নিয়ে ডাকাতের সাথে ফাইট করত। তুই পারবি ঢেঁকীতে ধান কুটতে?

— আগে হোক না বেরিবেরি! তো, শ্লীপদের আগে কি বেরিবেরি হয় রে? দেখ না একটু হাত বুলিয়ে আমার পায়ে!

— মাগো! আমি তোর পায়ে হাত দেব! গ্লাভস্ আছে তোর কাছে? হাতিরোগ থেকে যদি আবার আমার হাতে রোগ হয়? এমনিতে তোকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু রোগবালাই, ব্যারাম নিয়েতো আর এতো উদার হলে চলে না! তুই বরং, কাল গ্লাভস্ কিনে আনিস একজোড়া। দেখব না হয় তোর পা পরীক্ষা করে। এ টুকু কি আর পারব না? তা না হলে কিসের বোন?

— ডাক্তারি করতে হবে না তোকে। আমি ডাঃ অমিতাভকেই দেখাব।

— বাঃ! এই যে বললি ডাঃ অমিতাভ পা দেখেন না?

— এমন কথাতো বলিনি! তেমন দর্শনীয় পা হলে দেখবেন না কেন?

— দর্শনীয় পা! গুরুদেব টুরুদেবের শ্রীচরণের কথা বলছিস?

— শ্রীচরণ আর পা এক হল!? মহাপুরুষদের চরণ নিয়ে ঢং!

— অবশ্য তেমন পা মাথায় রাখা যায়। 'গীতগোবিন্দম্'এ জয়দেব কী লিখেছেন, পড়িস নি? আহা! যদি পড়ে দেখতি বা বুঝতি তুই! জয়দেব...

— তোর ব্রাঞ্চের জয়দেব? টাক্‌লো মতো, ঝুপো গোঁফওয়ালা হোৎকাটা? রাম-বদমাস, তিলে-খচ্চর একটা। আমাকে দেখলেই ওর গান আসে—'আমার

এই দেহখানি তুলে ধরো... তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো...' হাড়ে-হারামজাদা।

— ওতো জয়দেব সাহা। আমি ভক্ত-কবি জয়দেবের কথা বলছি।

— আধুনিক কবি? মাথা-মোটা,আধ-পাগল টাইপের লোক?

— না, না! আধুনিক-উত্তর-আধুনিক এসব নয় রে! জাত কবি!

— তোর জয়দেব বাবু কী বলেছেন পায়ের কথা?

— বলেন নি, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্ ....!?'

— 'দেখি পদপল্লবম্ উধারম্'! বাঃ! ঠিকইতো বলেছেন। 'উধার' মানে বাকিতে আর কি! একেবারে মাঙনা নয়, ক্রেডিটে পায়ের পল্লব, মানে পায়ের পাতা দেখতে চেয়েছেন কারো! মাথায় ঘিলু কমতো! কবিরা এমন জট-পাকানো, গাঁজাখুরি মাথা-খারাপ-মাথা-খারাপ কথাই বলে সবসময়!

— ওসব তুই বুঝবি না। সুন্দর পা হলে মাথায় রেখে দেখা যায়!

— তা হলে?

— তা হলে আবার কী?

— আমার পা দেখবেন ডঃ অমিতাভ।

— কেন তোর পা কি কাজোল, মনীষা আর মাধুরীর পা? আমি যাব না তোর সঙ্গে। দেখা গে তুই ডাঃ অমিতাভকে তোর বিচ্ছিরি নেস্টি আগ্‌লী লেগ্। হাত দেব না তোর পায়ে তুই মরলেও। তুই তোর পা নিয়ে জাহান্নামে গিয়ে মর।

— কেন, আমি বড় না? তোর দিদিতো, না কি? না কি কুষ্ঠ আছে আমারপায়ে? তোর অসুখ হলে আমি সেবা করি না? নেমকহারাম, যে বছর তোর প্লুরিসি হল, জন্-ডিজিজ্ হল তোকে বুলু পিসির মতো সেবাযত্ন করিনি আমি?

— জন্-ডিজিজ্! হি-হি-হি! হাসালি তুই, মাইরি!

— এতো হাসির কী আছে শেয়ালের মতো? জন্-ডিজিজ্ হয়নি তোর? আরে, জন্-ডিজিজ্! ন্যাবা, ন্যাবায় ধরেছিল না তোকে নাইনটিন নাইনটি সিক্সএ? মনে নেই? চোখ-মুখ, সারা গা হলুদ হয়ে গিয়েছিল তোর! তখন কে সেবা করল তোর, আমিই তো? পটের বিবি প্রতিমা একদিনও তোকে এসে দেখল না। উল্টে বলত— এবার খ্যাংড়িটা যেন টেঁসে যায়, ঠাকুর! ওর পোরশন্‌টা দখল করে বিল্ডিং'এর কাজে হাত দেব। ন্যাবায় যখন ধরেছে খ্যাংড়িকে এবার না নিয়ে ছাড়বে

না। কত শাপ-শাপান্ত করল তোকে। কত কষ্ট পেলি, অথচ এর মধ্যে তুই কিনা বেবাক ভুলে গেলি!

— ভুলব কেন, সবই মনে আছে তো!

— তাই বলছি! কী করে ভুলবি তোর গায়ে হলুদের কথা!

— আমার গায়ে হলুদ? ধ্যাৎ! মাথা খারাপ! পাগলের মতো কত কি যে আজেবাজে কথা বলিস না তুই!

—হি-হি-হি! তোর যখন ন্যাবা হল, মনে আছে, হলদে রোগা ফ্যাকাশে 'কাটপুত্‌লী' তোকে সারাদিন বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয় রাখতাম। তোকে দেখে পটের বিবি প্রতিমা, ডাইনোসোরসটা বলত, বিয়ে না হলেও এ যাত্রায় জন্‌-ডিজিজের কল্যাণে তোর নাকি গায়ে হলুদটা হয়ে গেছে। ...

— ডাইনীটা বলত এসব?

— হ্যাঁ। আরো কত ছড়া শোনাত ;

আজ খ্যাংড়ির গায়ে হলুদ, কাল খ্যাংড়ির বিয়ে
বর আসছে ধুঁধুলবাবা ছাদনাতলা দিয়ে!

— পটের বিবি প্রতিমা হারামজাদি! ওর আছেইতো মাকাল ফলের মতো চেহারাখানা। আসলে ওর বড়ো হিংসে রে, আমরা দুবোন ব্যাঙ্কএ চাকরি করি! আমরা ডক্টরেট। ওরতো হায়ার সেকেণ্ডারী পর্যন্ত বিদ্যে; গ্র্যাজুয়েট্‌ও না। রূপ দেখে দাদাটা বোকার মতো বিয়ে করে ফেলল।

— গায়ে হলুদ আমার? কখন হয়েছিল? এমন কথা বলেছিল ও?

— আরে বুঝলিনা, জন-ডিজিজে কেমন হলুদ বর্ণ হয়েছিল যে তোর! বেনে-বৌ, হলদে পাখীর মতো দেখাত তোকে। এটাকেই টিটকিরি দিয়ে বলত ও 'গায়ে হলুদ'। শুধু কি গায়ে হলুদ? তোর নাকি আবার মালাবদলও হয়েছিল! বলত সবাইকে ডেকে ডেকে, ফোন করে অসভ্যের মতো হেসে হেসে।

— সব্বোনাশ! মালাবদল হয়েছিল আমার? কার সাথে?

— কেন, ঐ বেল্লিক ধুঁধুল বাবাজীটার সাথে নাকি!

— মাগো! কী বলছিস তুই? হায় ঠাকুর! কী শুনছি আমি!!

—হ্যাঁ রে! প্রতিমা ডাইনীসোরসটা তাই বলতজনে জনে প্রত্যেককে ডেকে ডেকে। আসলে, তুই ধুঁধুল বাবাজীর ন্যাবার মালা পড়েছিলিস না? এতেই ও টিটকিরি দিয়ে বলত ফেরেব্বাজ মহাপুরুষ ধুঁধুল বাবাজীটার সাথে নাকি মালাবদল হয়ে গেছে তোর! এমন বজ্জাৎ ও!

— দাঁড়া! ওকে আমি শিক্ষে দেব! ধুঁধুল বাবাজীর সাথেই ওর মায়ের বিয়ে দেব আমি। মায়ের বিয়ে দেখাব ডাইনীকে আমি। আমার নাম প্রমীলা!

— তো, ঐ ন্যাবার মতো বাজে বেমোটার কথা ভুলে গেলি তুই?

— আরে ঐ বিচ্ছিরি ব্যারামটার কথা আমার ভালোই মনে আছে! 'আইতরমা'র পাশে কোথাকার কোন নওলকিশোর, রামখিলাওন্ আর ছগনলালের আখ-মাড়াই কল থেকে, শিউপ্রসাদের ডেরা থেকে কত কষ্ট করে খুঁজে খুঁজে ঘটি ঘটি আখের রস এনে আমাকে খাওয়ালি না তুই?

— ধুঁধুল বাবাজীর তাগা-তাবীজ-মাদুলী, জলপড়া সবই এনেছিলাম...

— তারপর ধুধুল বাবাজীর 'ধুঁধুল-স্পেশাল' ন্যাবার মালা এনে পড়ালি না আমাকে! তা মনে আছে আমার সব!

— তবে যে ভাবখানা তোর জন্-ডিজিজ্ যেন হয়নি?

— হয়েছিল ঠিকই! দুঃখ হয়, তোর আর কাণ্ডজ্ঞান হল না এই জীবনে! জন্-ডিজিজ্ নয়, রোগটা জণ্ডিস্। ন্যাবাকেই জণ্ডিস্ বলে।

— তোর মাথা! মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি, তিনটা বিষয়ে এম.এ.। রোগ-বালাই সম্পর্কে কম জানে সে? সে পর্যন্ত বলল 'জন্-ডিজিজ্' রোগটার নাম। আর কমন্‌সেন্স কি বলে? 'জন্' বলেতো একটা নাম আছে। কিন্তু 'ণ্ডিস্' বলে কোন কথা আছে? কথাটা 'ডিজিজ্' মানে রোগ। মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি, বাংলা মাতৃভাষা না হলেও ভালো বাংলা জানে। বারো বছর হল তার এই আগরতলায়। ইংরেজীও সাহেবদের মতো বলে। স্প্যালিংও বলে দিয়েছে; J-o-h-n D-i-s-e-a-s-e.

— বলেছে তোকে! তোর সাথে তর্ক করে লাভ নেই!

— মিথ্যে বলছি আমি? সেদিন ক্যান্টিন-বয় গন্ধগোকুল সাহা আমাকে বলল, আমার চোখগুলো নাকি একেবারে হলুদ হলুদ দেখাচ্ছে। মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি কাছেই ছিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম চোখ হলুদ হচ্ছে শুনে। চারদিকে আবার যা

জন্-ডিজিজ হচ্ছে। মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে বললাম, আমার কি জন্-ডিজিজ্ হবে মিঃ মূর্ত্তি? আর কথাটা শুনেই তোর মতো কয়েকটা মুর্খ হেসে কুটি কুটি!

— হাসবেই তো। ক্রীষ্টাল বুরবাকের মতো কথা বললে হাসবে না?

— তো, শোন না! ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার দিল এক ধমক! বলল 'কথাটা 'জন্-ডিজিজ'ই। জণ্ডিস নয়। ডক্টর মিস্ পৃথুলতা, সরি, প্রীতিলতা ইজ্ রাইট্।' তারপর, বুঝিয়ে বলল সবাইকে— জন্ বুশ বলে এক সাহেব, জর্জ বুশের ভাই না ভায়রা ভাই কী যেন বলল, রোগটার অষুধ আবিষ্কার করেছিল। তাই ওর নামেই নাম ব্যারামটার। তারপর মুখে আর 'রা' নেই কোন শর্মার। মিঃ কৃষ্ণমুর্ত্তির কথায় তারপর সবাইকে চা খাওয়ালাম আমি। আমি কাঁচা কাজ করি না বুঝলি? আ গিয়া বড়ি 'জণ্ডিস-ওয়ালী'! হল তো?

— খুব হয়েছে! আর তর্ক করতে হবে না তোকে!

— তাহলে মানলিতো, ব্যারামটা 'জন-ডিজিজ'ই? খুবতো পণ্ডিত ভাবিস নিজেকে! দু-পাতা ইংরেজী জানলেই কেউ পণ্ডিত হয় না রে!

— তোর জন্-ডিজিজ্ তোর মাথায় থাক! তো, একটু আগে যে আমার পায়ের নিন্দে করলি! আমার সামনে আমার পায়ের নিন্দা! এখন দেখলি তো! বাবা লোকনাথ ঠিকই বিচার করবেন। শ্লীপদ রোগে যদি ধরে, এমনিতেই তোর যা একখান গজকচ্ছপ আকৃতি!

— তাহলে বজ্জাৎ কৃষ্ণমূর্ত্তিটা আগেই টের পেয়ে গেল! এখন সবাইকে বলে বেড়াবে, 'শোন! শোন!! মিস্ পৃথুলতার পায়ে ভয়ঙ্কর শ্লীপদ হয়েছে।' হয়তো আমাকে ব্ল্যাকমেল করবে। চা খাওয়াতে হবে ওকে, না জানি কত শত শত কাপ! শ্লীপদের ডাক্তার নেই রে আমাদের আগরতলায়?

— বিপদের ডাক্তারই নেই! আবার শ্লীপদের ডাক্তার...

— বাবা লোকনাথ! এখন সত্যি সত্যি যদি...

— তো, এখন কী করবি? যদি তেমন কিছু হয়ই?

— অষুদ-পথ্য পাওয়া যাবে না আগরতলায়?

— শ্লীপদের অষুদ আগরতলায়? শুধু পদ বা পায়ের অষুধ-ডাক্তারই নেই। মনে নেই তোর, একবার হাজা হল তোর পায়ে? কোন দোকানেই হাজার

অষুধটা নেই। অগত্যা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে অভিনব, অব্যর্থ ফলপ্রদ হাজার হাজার লোকের প্রশংসা-ধন্য 'কালান্তক' মলম কিনে পায়ে মাখলি। তারপর পা ফুলে তোর যেন পাশবালিশ। কলকাতা গিয়ে চিকিচ্চো করিয়ে সুস্থ্ হতে হল তোকে। মনে নেই? এখানে পা নিয়ে কেউ ভাবে, আগরতলায়? মানুষ শুধু পদমর্যাদার কথা মুখেই বলে! শ্লীপদের ডাক্তার, অষুধ কোথায় পাবি? ভেলোর যেতে পারিস... আপাতত তুই বরং এ্যাড্‌ভান্স ব্লাডটা রুটিন্ টেষ্ট করিয়ে নে। শ্লীপদের জার্ম থাকলে হয়তো প্রাথমিক চিকিচ্চোটা নিজে নিজে করতেপারবি।

— কোন ল্যাবরেটবীতে যাব রে? কোনটা ভালো হবে?

— কেন, তোর ব্যাঙ্কের পাশেইতো একটা আছে! বেশ ঝক্‌ঝকে। কাজোলের মতো নাদুস-নুদুস একটা মেয়ে বসে থাকে সারাদিন।

— আমার ব্যাঙ্কের পাশে?

— হ্যাঁ। ঘড়ির দোকানটার পাশে... ইয়া বড়ো সাইন্‌বোর্ড দেখিসনি লেখা আছে... 'এখানে দিবারাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা রক্ত-মল-মূত্র-কফ-শুক্র ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।' সেবাই আমাদের মূলধন। আপনাদের পরীক্ষা প্রার্থনীয়...

— রক্ত-মল-মূত্র-কফ-শুক্র-শনি...? শুধু শুক্র-শনি দুদিন মাত্র? আবার পরীক্ষাও দিতে হয়? ওরে বাবা! রক্ত পরীক্ষা করানো যাবে না নিজে পরীক্ষায় না বসে? রুগীকেই আবার পরীক্ষা দিতে হবে! কালে কালে কতো নিয়ম হবে!

— ধ্যাৎ! পরীক্ষা কিসের আবার?

— এই যে বললি, পরীক্ষা প্রার্থনীয়...

— ওটা কথার কথা। মানে, তোমাকে ঠকাতে পারবে কি না, বা কতটুকু ঠকাতে পারবে, এটাই ওরা পরীক্ষা করে দেখবে আর কি. তোকে ঠকাবে কে? স্বয়ং মূর্তিমান শ্রীকৃষ্ণই তোর কাছে ঠকে যাচ্ছে দীর্ঘ বারো বছর ধরে... হি-হি-হি।

— থাপ্পর খাবি তুই বাজে কথা বললে।

— তা না হয় খাব। আগে তুই ভেলোর যা।

— বেলুড়! আমি কি বেলুড় মঠের সন্নিসিনী হব?

— আরে বোকা, বেলুড় নয়। ভেলোর। দক্ষিণে, সাওথ ইণ্ডিয়া...

— ফুঃ! ভেলোর? মরলেও আর যাব না। সে বার পেটের ট্রাবলস্ ছিল

খুব। ধুধুল বাবাজীর 'অম্বলনিবারণী' আর 'মেদনাশক' বটিকা খেয়ে, মাথায় 'নিদ্রাবিলাস' তেল মেখে, যাই যাই অবস্থা হয়েছিল না? ওমা! এতো কাঠখড় পুড়িয়ে ডাক্তার দেখালাম। ইয়া বড়ো দেড়-হাত লম্বা ডিগ্রীধারী সাহেব ডাক্তার দেখিয়ে প্রেস্‌ক্রিপশন করল তিন প্যাকেট ইশবগুল্। কেন ইশবগুল কি আমাদের আগরতলায় নেই? ভেলোর যেতে হয়?

— ভালো কথা, ভেলোরের কথায় আমার ভেলিয়ামের কথা মনে পড়ল। দিদি ভেলিয়মম-দশ আছে রে?

— ভেলিয়াম-টেন্ বল! কোন অষুধের নাম বাংলায় বলতে নেই। ব্যারামের দেবতা রাগ করে।

— ভেলিয়াম খেয়েই কী হবে? ভেলিয়াম-৫০০ খেলেও ঘুম আসে না আজকাল। শালা, যে ডাক্তারের কাছেই যাও, খালি ঘুমের অষুধ আর ঘুমের অষুধ। আর যেন কোন অষুধ নেই বাজারে! আজ আর ঘুমুব কখন... ঘুম গেছে হিরাট-গজনী-কান্দাহার, আফগানিস্তান!

— রাত কটা বাজল রে?

— সাড়ে তিন। ঠাকুর কী বলছেন জানিস?

— কোন ঠাকুর? বাবা লোকনাথ? রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে?

— না না। রণে-বনে নয়, দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের কথা বলছি।

— ভেলিয়াম-টেন সম্পর্কে?

— তোর মাথা! ঠাকুর কি ঘুমের অষুধ ভেলিয়াম-টেন খেতেন? ঠাকুর বলছেন, রাত জাগে কে? রাত জাগে তিনজন। রুগী-ভোগী-যোগী।

— আর কেউ জাগে না? শীলাদি বলছিল, বিয়ের প্রথম দিকে ন্যাকা ন্যাকাচৈতন বর-বৌও নাকি খুব রাত জাগে।

— আদেখলামো আর কি! কোমরের ব্যাথাটায় অস্থির ছিলাম। আবার শ্লীপদের বিপদ... শালা, সরি, সম্বন্ধীর ব্যারাম আর পিছু ছাড়ছে না কিছুতেই চল্লিশ বছর ধরে। হ্যাঁরে, কী একটা রাত-জাগা পাখী যেন ডাকছে, একঘেয়ে কুক্-কুক্-কুক্-কুক্ করে? কেমন ভয় ভয় করে না?

— ও কিছু নয়! যম-কোকিল বোধ হয়।

—যম-কোকিল? তারপরও বলছিস কিছু নয়। বলিহারি সাহস তোর! এজন্যেই বিয়ে হল না তোর। মেয়েদের একটু ভয়-ডর থাকতে হয় রে! মাগো! একে তো কথা হচ্ছে অসুখ-বিসখ, জীবন-মরণ নিয়ে, তার মধ্যে আবার যম-কোকিল! যত্ত অলক্ষুণে কথা! অষ্টমের পেয়াদা, যমের দূত না তো?

— আসুক যম! যমের দূত! আমাদের দেখবেই না?

— দেখবে না? যমদূতের চোখে ছানি পড়েছে বুঝি?

— না। বড়বৌদি, পটের বিবি, বড়বৌদি প্রতিমা, ও হারামজাদি সব সময় বলে না! এ দুটোকে যমেও চোখে দেখে না! এ দুটো যমের অরুচি...

— যমে নিয়ে যাক হারামজাদি প্রতিমাকে। ও যমের সুরুচি। ভালোই হলো, যম আমাদেরকে দেখবে না। যম-কোকিল ডাকা কি খুব অলক্ষুণে রে?

— হ্যাঁ। যেবার বুলু পিসি মারা গেল, অমাবস্যা দিন, খুব যম-কোকিল ডাকত। তোর মনে নেই? বুলু পিসি খালি বলত 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।'

—মাগো! মরণ নিয়েও আদেখলামো! আমি বাপু মরতে পারব না। যে মরে মরুক গে! প্রমীরে, পাখীটা কেমন কুক্-কুক্-কুক্-কুক্ ডাকছে রে! কেমন যেন ঘুম ঘুম পাচ্ছে রে! আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে... আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে। ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এস। খাট নেই পালং নেই চোখ পেতে বস। হু-উ-উ-উ....

— দিদি, ঘুমুচ্ছিস? না রে?

— ঘুমোয় আমার শত্তুর! ঘুমোয় আমার জুতি! আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে... আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে...কপাল আমার! ঘুমুব আমি! ঘুম আসে? ঘুমতা-ঘুমায়-ঘুমতা-ঘুমায়.. সাম্‌তা প্রসাদ-ঘুমতা প্রসাদ ওরা জানি কেমন আছে রে! ছাপ্‌ড়া চলে গেছে ওরা পার্মান্টেলি। বাজরা-গেহুঁ-গন্নার চাষবাস, ক্ষেতিবাড়ি করছে এখন। খৎ লিখেছিল ওরা আমাকে... সে কতো কাল আগে! ভোজপুর আর ছপ্‌ড়া জেলা বেড়াতে যেতে বলেছিল কতো করে! হ্যাঁরে, তুই ঘুমুচ্ছিস?

— ঘুমুলে কি আর তোর সাথে কথা বলছি? দিদি, আমার না বামপাশটা, বুঝলি কোমরের বাম পাশটাই কেমন যেন শিন্‌শিন্-টন্‌টন্ ব্যাথা করছে! লক্ষণটা ভালো ঠেকছে না। শীলাদির বরতো কোমর কোমর করেই গতবার টেঁসে গেল...

এখন এই বাম দিকটা যদি... আয় ঘুম যায় ঘুম দত্ত-পাড়া দিয়ে... আয় ঘুম যায় ঘুম... ঘুনুরে... ঘুনুরে ঘুনু... বুলু পিসি বলত আমরা দুবোনকে কোলে নিয়ে। বুলুপিসি তুমি কোথায়... ঘুনু রে... ঘুনু... ঘু—উ—নু—

'শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।' মন্দিরের দেবতা ব্যাধি! দেবতা বেশ পাকাপোক্ত ভাবে আছেন শ্রীমতি ব্যারামবিলাসিনীদের মন্দিরে। নিত্য চালকলা খাচ্ছেন! ষোড়শোপচারে পূজো পাচ্ছেন। ব্যাধিমন্দিরের পুরোহিত যদি হন বৈদ্য বা চিকিৎসক, তো পুরোহিতের দক্ষিণাটিতো যোগাতে হয় মন্দিরের মালিককেই! দেহধারীকেই এখানে দেবতা ও পুরোহিতের সেবা করতে করতে জেরবার হতে হয়। রাত গভীর। শহরের এক প্রান্তে পুরনো প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গলাকীর্ণ শরিকী বিশাল বাড়িতে পাশাপাশি খাটে শুয়ে আছেন শ্রীমতি পৃথুলা ও শ্রীমতি ক্ষীণাঙ্গী। ডক্টর মিস্ বৈদ্যদ্বয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। বিগত কয়েক দশক যাবৎ অনূঢ়া। দীর্ঘ অবিবাহিত জীবন ও কর্মহীন কর্মস্থলের অখণ্ড অবসরে তাঁরা দুটো সম্পদ লাভ করেছেন, ডক্টরেট ডিগ্রি ও ব্যারামবিলাস। অখণ্ড অবসর অথচ ঘুম আসে না ব্যারামবিলাসিনীদের।

— হ্যাঁরে, প্রমী! ধুঁধুল-বাবাজীর মন্ত্রটা মনে আছে তোর? সেই যে মন্ত্রটা যা পড়ে ধুঁধুল-বাবাজী আমাদের মুশকিল আসান করত...

— কোনটা বলতো?

হলদে-সবুজ ওরাং ওটাং
ইট-পাটকেল চিৎপটাং
গন্ধগোকুল হিজিবিজি
নো এড্‌মিশ্‌ন ভেরি বিজি
মুশকিল আসান ওড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি... এটা?

— না, না। সেই যে...বদ্যিরাজা ধন্বন্তরী...

— দিব্যি মনে আছে। ধুঁধুল-বাবাজীর মন্ত্র নয় এগুলো। এটাও একটা সুকুমারীয় কবিতা। তোকে বোকা পেয়ে তোর কাছে মন্ত্র বলে চালিয়ে দিয়েছে—

বাদ্যরাজা ধন্বন্তরী
শিষ্য হয়ে স্মরণ করি।
মিথ্যে রোগের নিত্যি ভাণ
ওষুধ তাদের মৃত্যুবাণ।
কপট-রুগী খবরদার
ওষুধ আমার সমঝদার।

— মন্তরটা যারই হোক, দিব্যি ঘুম পায় রে এটা জপ করলে। দেখ না, তোরও ঘুম পাবে। হলদে-সবুজ ওরাং ওটাং.... ওষুধ আমার সমঝদার....

পৃথিবী এখনো তেমন নির্দয় নয়। ভোরের স্নিগ্ধ-শীতল হাওয়া এই নোংরা শহরের আনাচে কানাচেও তার করুণা বিতরণ করে। শ্রীমতি পৃথুলা ও ক্ষীণাঙ্গী নাম্নী দুই প্রায় প্রৌঢ়া কুমারীর বেঢপ শরীরে প্রকৃতি তার কোমল স্পর্শ পাঠিয়ে দেয় শীতল সমীরণের হাতে। ঘুমিয়ে পড়ে এক সময় দুবোন। ঘুমেই শান্তি। ঘুমই মুক্তি। ঘুমই এনে দেয় প্রতারণায় প্রশান্তির প্রলেপ, হৃদয়ক্ষতে বেদনানাশক মলম।
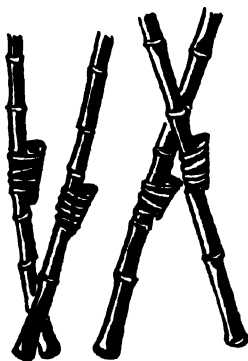
যাঁরা যথেষ্ট লম্বা নন, লম্বা হতে ইচ্ছুক তাঁদের উপযুক্ত বাহন হাড়গিলে, হাঁড়িচাঁচার ঠ্যাং বা রঘু-ডাকাতের 'রণপা'।

।। তিন ।।

Sleepography & Acid-o-fashion
নিদ্রালেখ এবং অম্লবিলাস

শহরের এক প্রান্তে শরিকী ঝামেলায় জেরবার এক খণ্ডহর বিশাল হানাবাড়ি! ভাগের মা গঙ্গা পায় না, কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করার নেই। আঁসশেওড়া-ভাট-ভেরেণ্ডা ও শুট বনের আড়ালে লুপ্তপ্রায় প্রজাতির অনেক জীব যথা বাস্তু সাপ, গন্ধগোকুল (খট্টাস), নকুল, উদবিড়াল, কাঠবিড়ালী, হুঁতোমপ্যাঁচা-ডাহুক-যমকোকিল-হট্টি-টিটি ইত্যাদির মতো অকুলীনদের বাস। কয়েকটি প্রাচীন মহীরুহ বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় মগডালে তাদের কাক ও শকুনের বিচ্ছিরি শিল্প-সৃষ্টি, ডিম পাড়া ও শাবক প্রতিপালনের তাগিদে তৈরী বাসা। বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড আর দেশী ফুলের গাছ ঋতু বিশেষে অনিচ্ছাকৃত ফুলও ফোটায়।

প্রাগৈতিহাসিক এই বৈদ্যবাড়ির এক হিস্যা কামড়ে পড়ে আছেন শ্রীমতি পৃথুলা ও ক্ষীণাঙ্গী বৈদ্যরা। ক্ষয়িষ্ণু বনেদী ও একদা যৌথ পরিবারের অন্যান্য অংশীদারেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এ বাড়িতে এখনো বাস করে। কেউ কারো অংশ ছাড়তেও নারাজ। যে যার হিস্যেয় এক একটি দূর্গ বানিয়ে বাস করে। এই গা-ছমছম্ হানা বাড়িতে সন্ধেবেলায়ই রাত দুপুর। শ্রীমতি পৃথুলাদেবী ও ক্ষীণাঙ্গী দেবীরা যে যার মতো ভাবনায় ব্যাস্ত। তাঁরা ভাবনার গোড়ায় জল দিচ্ছেন—

— হ্যাঁ রে, দিদি! কী ভাবছিস রে?

— ভাবছি না কিছুই!

— মিথ্যে বলছিস। তুইতো শুক্রবার দিন মিথ্যে বলিস না রে!

— না রে, কী ভাবা যায় তাই ভাবছিলাম!

— ভাবনা আসছে না, সেই তো?

— তাই ভাবতে পারছিনা কিছু...

— ভাবের নামতাটা জানিস না? নামতাটা পড় !

— ভাবের নামতা!

— হ্যাঁ রে! সুকুমারীয় ভাবের নামতা ঃ

ভাব একে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ঢেকুর উঠে চোঁয়া।
চার ভাবে চতুর্ভুজ, ভাবের গাছে চড়,
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড়।

— ভাব একে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া... ধোঁয়া... ধোঁয়া... হ্যাঁ রে, প্রমী ঠিকইতো বলেছিস! কেমন যেন খালি ভাবনা আসছে রে ধোঁয়ার মতো...

— আমারো একটা ভাবনা এসে গেছে!

— কী ভাবনা রে?

— 'অ্যাসিড-ও-ফ্যাশ্‌ন'এর ভাবনা!

— 'অ্যাসিড-ও-ফ্যাশ্‌ন'?

— অম্বলনিবারণী সমিতি 'অ্যাসিড-ও-ফ্যাশ্‌ন'এর মেম্বার হবি তুই?

— অ্যাসিডোফ্যাশনটা আবার কী রকম ফ্যাশন? এই বুড়িবেলায় এমন গতর নিয়ে আবার স্টাইল-ফ্যাশন করলে বাড়িতে ঢিল পড়বে না? বেতমিজ পাবলিক খিক্ খিক্ করে হাসবে না?

— আরে এ ফ্যাশন সেই ফ্যাশন নয় মোটেই।

— তা হলে?

— বললাম না, আমাদের ব্যাঙ্কের নরোত্তম দা, নারোত্তম প্রামানিকের কথা? নরোত্তমদা, জিনিয়াস ছেলে। অন্য কোন চাকরী না পেয়ে আপাতত আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়াচ্‌-ম্যানি মানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমানো-দারোয়ান। আমাদের মতো অ্যাসিডের রুগীদের নিয়ে ও খুব ভাবছে! রিটায়ার করে, ও নাকি একটা গভর্ণমেন্ট রেজিস্টার্ড সোসাইটি, 'অম্বলনিবারণী সমিতি' স্থাপন করবে।এটির হেড-কোয়ার্টারস্‌ হবে ওর নিজের গ্রাম কালাফার্নিয়ায়।

— কালাফার্নিয়াটা কোথায় রে? আফ্রিকা না আমেরিকায়?

— আরে না! এটা ত্রিপুরারই এক গণ্ডগ্রাম। আসলে ওর গ্রামের নাম 'কালাপানিয়া'! ও স্টাইল করে লিখবে, কালাফার্ণিয়া। নিজস্ব ই-মেল e-mail: acdofsn @ sancharnet.in আর ওয়েব-সাইটও থাকবে। লেখা থাকবে—
Visit us at our Website:- www. acidofashion.com

— বেশ তালেবর বুদ্ধিমান ছেলে তো!

— আরো শোন না! সমিতির ইংরেজী নামটাও কেমন যুৎসই! অ্যাসিড-ও-ফ্যাশন্। একবার 'ACID-O-FASHION'এর সভ্য হলে তুমি অ্যাসিডোকোলা বিনিপয়সায় পাবে। আরো অনেক সুযোগ সুবিধে পাবে। অ্যাসিড্ বা গ্যাষ্ট্রিকের রুগীকে দেখবি কেউ তখন আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। কাতারে কাতারে মানুষ অ্যাসিডোফ্যাশনে নাম লেখাবে।

— কী লাভ হবে?

— কী লাভ হবে মানে? নরোত্তমদার টনিক অ্যাসিডোকোলা খেয়ে অ্যাসিডের ব্যারাম থাকবে না কারো। যা খুশী তা খেতে পারবি তখন। কামরাঙ্গা আর কাঁচালঙ্কার পায়েস, তেঁতুলের 'আবার-খাব', জলপাইয়ের হালুয়া, ওল-তেঁতুলের 'নরোত্তম-স্পেশাল' করমচার 'কড়াপাক', কামরাঙ্গার 'কেড়ে-খাব', বিলিতি আমড়ার মোরব্বা... আরো কত মুখরোচক আইটেম!

— কাঁচালঙ্কার পায়েস? জলপাইয়ের হালুয়া!?

— হ্যাঁ এসব আইটেম নরোত্তমদা অ্যাসিড্-ও-ফ্যাশনের ফ্যাক্টরীতে তৈরী করে বিক্রি করবে। তেঁতুলের 'আবার খাবো'টা হবে ইস্পেশাল আইটেম। তেঁতুল নাকি খুব উপকারী, নরোত্তম দা বলে। অথচ গ্যাষ্ট্রিক-অ্যাসিডের ভয়ে কতো লোক খেতে পারে না তেঁতুল। নরোত্তমদা এ সমস্যাটা দূর করবে। আয়ুর্বেদে নাকি লেখা আছে তেঁতুল খুব উপকারী! এমনকি কাঁচা বা ডাঁশা-পাকা বাঘা-তেঁতুলও... যত্ত খুশী, যখন খুশী খাও...

— মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি, বুঝলি, বেটা মাসে সাড়ে সাত কে. জি. তেঁতুল খায়। ও বলে কিনা, 'মিস্ পৃথুলাদেবী, সরি, মিস্ প্রীতিলতা দেবী, তেঁতুল খান, তেঁতুল খান। তেঁতুল খেলে আপনার গ্যাষ্ট্রিক ভালো হয়ে যাবে। তেঁতুল টক লাগে একথা কাউকেবলবেন না যেন। সবাই বলবে তা হলে আপনি বুড়ি হয়ে গেছেন।' আয়ুর্বেদে, ইম্‌লী-শাস্ত্র, 'ইমলী-তত্ত্ব-মানস'এ নাকি তেঁতুলকে 'তিত্তিরি' বলে। লেখা আছে,

তিন্তিড়ী তিন যুগে বিধাতার সৃষ্টি,
বুড়োদের টক লাগে ছেলেদের মিষ্টি।

ডক্টর মিস্ পৃথুলাদেবী হ্যাংলাথেরিয়াম্ বলে কারো কথা তেমন মনে রাখেন না, কারো তির্যক মন্তব্য গায়ে মাখেন না। কারো পরামর্শও ঠেলে ফেলেন না। তাঁদের হিতৈষী এবং বন্ধুবান্ধবও প্রচুর। শ্রীমতি পৃথুলাদেবীর ব্যাঙ্কের সম্মানীয় গ্রাহকবৃন্দের মধ্যে সর্বশ্রী রামখিলাওন, ছগনলাল, শিউপ্রসাদ, বুলাকিপ্রসাদ ছাড়াও ছাপড়া ও ভোজপুর জেলার অনেক কৃতবিদ্য অনাড়ম্বর ধনবান, নিরক্ষর ব্যাক্তিদের সাথে শ্রীমতি পৃথুলাদেবীর জান্-পহ্চান আছে। বিগত আঠারো বছর যাবৎ তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগীদার। তেমনি মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি নামক একজন আধাবাঙ্গালী মদ্রদেশীয়ও তাঁর সহমর্মী। আরো আছেন শ্রী নরোত্তম প্রামানিক যিনি ব্যাঙ্কের নিরাপত্তারক্ষী হলেও একজন প্রতিশ্রুতিময় ভাবী শিল্পপতি, চিকিৎসাবিদ, রসায়নবিদ ও স্বপ্নদ্রষ্টা। আমরা কর্মবীর শ্রী নরোত্তম প্রামানিকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীমতিপৃথুলাদেবীর অভিজ্ঞতার কথা শুনি—

— দিদি রে! আমি বোধ হয় টেঁসেই যাব রে ...

— না, না। টেঁসে যাবি বললেই হল? তেমন কিছু হয়নি। তোর গ্যাস আর এ্যাসিড্ হয়েছে বাধ হয়। যা হাবিজাবি অখাদ্য খাস তুই! ভুঁতি সহ খাঁজা কাঁঠাল খেয়েছিলিস নাকি?

— ছিঃ! কাঁঠাল আমার সয় না। পেটে গেলেই কাঁঠাল আবার আম হয়ে বেরিয়ে যায়। আগে আস্ত কাঁঠাল খেতে পারতাম। ছেড়েই দিয়েছি কাঁঠাল খাওয়া...

— কোথায় ছেড়েছিস? খেয়ে খেয়েই তোর এই জড়ভরত কুম্ভকর্ণের মতো ফিগার! হাবিজাবি খাওয়া বন্ধ কর।

— তুই বরং খাওয়া শুরু কর!

— তুইই জাবনা খাওয়া বন্ধ কর; দেশের উপকার হবে।

— খাওয়া বন্ধ করলে আর এই বিচ্ছিরি গ্রহ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোন লাভ আছে রে?

— হ্যাঁ! প্রাণে বেঁচে থাকলেতো খাবি! এখন তোর একটু নরোত্তম দা'র এ্যান্টাসিডের শর্বত বা Acid-o-cola খেতে পারলে কাজ হত্তো।

— এ্যাণ্টাসিডের শর্বত! Acid-o-cola? জীবনেও নাম শুনিনি... Coca Cola খেয়েছি। নিজে কিনে খাইনি; বিয়ে-বাড়ি, নেমন্তন্ন বাড়ি

গিয়ে খেয়েছি এন্তার! তো, Acid-o-cola কী জিনিষ?

— Acid-o-cola, Antacid-o-cola খাস নি কোনদিন?

— নামও শুনিনি!

— আমাদের ব্যাঙ্কের গার্ড নরোত্তম দা, নরোত্তম প্রামানিক, খুব চালাক-চতুর ছেলে। এ্যান্টাসিডের শর্বত, ডায়জিন, ডায়বল, জেলুসিল, রেন্টাক্, জিন্টাক্, হিস্টাক্ আরো কত কত জিন-বল-জিল-টাক আর দুনিয়ার যতো হার্বাল পাঞ্চ করে ও নাকি বানায়। নিজের ফর্মূলা ও প্যাটেন্ট নেবে। নিয়ে রিটায়ারমেন্টের পর এ্যান্টাসিড ড্রিঙ্কস্ 'অ্যাসিড্রিঙ্কস্'এর স্বাধীন ব্যাবসা করবে। Acid-o-cola, Antacid-o-cola, Acidup, Acidown Acidrinks, Acidici, Acid-o-fasion এ্যান্টাসিড শর্বতের এসব বাণিজ্যিক নামের ও পেটেন্ট নিয়ে নিয়েছে অলরেডি। ও নিজে আগে তেলে-ভাজা, সিঙ্গারার দিকে এক নাগারে দশ মিনিটের বেশী চেয়ে থাকতে পারত না।

— তেলে-ভাজার দিকে চাইতেই পারত না?

— এক টানা দশ মিনিটের বেশী অবশ্য!

— খুব লোভী ও? টল-টল করে জিহ্বায় লালা ঝড়ত বুঝি ওর?

— আরে না! লালা ঝড়বে কেন! অ্যাসিড্ হয়ে যেত ওর সেই চাওনিতেই। পেট ব্যাথাও শুরু হত। আর অ্যাসিডোকোলা খেয়ে খেয়ে এখন রোজ তেলেভাজা, পেঁয়াজী-দো'পেঁয়াজী-চার'পেঁয়াজী, পাপড়, ডালমুট, সিঙ্গারা আর ডালপুরী দিয়ে টিফিন সারে। আগে অ্যাসিডের জ্বালায় ভুগত। বিখ্যাত পেটরোগা ছিল; এখন গোবর গামার মতো স্বাস্থ্য ওর। তাঁড়ি-লাপ্তী-ধেনো, সস্তার নেশা কফ্-লিঙটাস্ ফেন্সিডিল্ আর ভেজাল বিলিতি মদও খায়! পান দোকান থেকে পাঁচ টাকা দামের গাজার চুরুট খেয়ে তুটীয়ানন্দ বোম্ ভোলানাথ হয়ে থাকে।

— খুব হয়েছে! এবার প্রলাপ বন্ধ কর! দুনিয়ার যত ...

— প্রলাপ! আমি কথা বললেই প্রলাপ!

— মাগো! বাম কোমরটা এমন কামড় দিচ্ছে, বুঝলি, মনে হয় এই রাত দুপুরেই না হাসপাতাল যেতে হয়! শালার বাম দিকটা না...

— ঠিক বাম দিকটা তো?

— হ্যাঁ। আমি কি মিথ্যে বলছি? বাম দিকতো বাম দিকই। ঠিক বাম দিক আর বেঠিক বাম দিক আছে নাকি?

— চল দুজনেই কাল কোমর স্পেশালিষ্ট ডাঃ অমিতাভকে দেখাই!

— কিন্তু কোমরের ডাক্তার পেট দেখবেন তো?

— কেন দেখবেন না রে? কোমরের কাছাকাছিইতো পেটের অবস্থান। কতটুকুইবা দূরত্ব! ইচ্ছে করলেই দেখতে পারেন!

— ভিজিট্ কত যেন রে?

— ষাট টাকা বোধ হয়, শীলাদি বলছিল।

— ছি! ষাট টাকা ভিজিটের ডাক্তার দেখাব আমরা শেষ পর্যন্ত! ইজ্জত থাকবে আমাদের? পয়সা কম আছে আমাদের? বললি না তখন, দুশো টাকা ভিজিট দিয়ে দেখাব আমরা!

— না, না! মিছিমিছি এত টাকা খরচ করব নাকি? বলবি না কাউকে! বলবি দুশো টাকা ভিজিট ডক্টর অমিতাভের ...

— চল, যাই তবে দুজনেই!

— ভালোই হল! আমি একলা যেতে, বুঝলি ঠিক ভরসাও পাচ্ছিলামনা... তাছাড়া, শত হলেও ব্যচিলর্ ডাক্তার না...আজকাল ছেলে-ছোকড়া ডাক্তারদের প্রতি বিশ্বাস নেই !

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর! নানান ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বাসের মর্মমূলে যখন আঘাত পড়ে, তর্কেই কৃষ্ণ লাভের প্রয়াস নিতে হয় তখন! শ্রীমতি পৃথুলাদেবী ও ক্ষীণাঙ্গীদেবীদের বিশ্বাসে চিড় ধরে গেছে সেই উত্তর-যৌবনের দিনগুলোতেই। ভূত-ভগবান-মানুষ কারো উপরেই আর তেমন বিশ্বাস নেই তাঁদের। বিশ্বাস নেই ঘুমরে দাওয়াই ভেলিয়াম-৫,১০,২০ কোনটার উপরই। আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে! কিন্তু এই পোড়া চোখে আর পিঁড়ি পেতে বসে না। রাত দুপুর! ঘরের পাশে চালতা গাছে অশরীরী বুলুপিসি এসে ঝপ্ করে বসেন। ভূত-প্রেত আর নিশাচর মানুষের ভয়ে কেমন যেন নির্জীব হয়ে থাকেন দুই বোন। ভয়ঙ্কর হুতুম-প্যাঁচা আর রাত-জাগা পাখীই শুধু তাদের আলোচনাসভা সরগরম করে রাখে। শ্রীমতি পৃথুলাদেবী তাঁর অনুজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—

—হ্যাঁ রে, প্রমী! চালতা গাছে শব্দটা শুনলি?

—হ্যাঁ! বুলুপিসি এল বোধহয়!

—কোথায় থাকে রে বুলুপিসি দিনের বেলা?

—Ghostism অথবা প্রেতোলজির বই পড়লে এসব জানা যায়।

—Ghostism প্রেতোলজি? কী জানি বাবা! প্যাথোলজি জানি, প্রেতোলজির কথা শুনিনি। 'লজি' 'ক্রেসি' আর 'ইজম্' বড়ো খারাপ জিনিস রে!

—কতো নূতন নূতন 'লজি' আর 'ইজম' বেরুচ্ছে আজকাল! প্রেতোলজি মানে প্রেত-চর্চা আর কি! ঘুম আসবে-আসছি করছে অথচ দেখ...

—ঘুমের ছড়াটা মনে নেই তোর?

—কোনটা? সেই যে, ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি? হলদে সবুজ ওরাং ওটাং, ইট পাটকেল চিৎপটাং... এগুলো?

—না। 'আয় ঘুম যায় ঘুম দত্তপাড়া দিয়ে'।

—এটাইতো এতক্ষণ মনে মনে আওড়াচ্ছিলাম। এ ছড়াটায় ঘুম আসে কে যেন বলেছিল। একদম বাজে কথা, ছড়াটা বাজে একদম রাবিশ। ঘুম ধারে কাছেও আসে না।

—তা হলে, ডক্টর সেনের থেরাপীটা, ভেড়া গুণে দেখ না?

—তুই গুণছিস না কেন?

—গুণলাম না! তিন লক্ষ বারো হাজার সাতশো তেষট্টি পর্যন্ত গুণলাম তো। কি জানি কোন ভুল-ভাল হল কি না! আবার গুণতে হবে... পা'টা বড়ো জ্বালাচ্ছে কি না... ডেল্ কার্ণেগী সাহেব যেন কি বলেছিলেন...

—ও বেটা আবার কে রে?

—বড় ডাক্তার। নিদ্রাতাত্ত্বিক বোধ হয়, শীলাদি বলছিল...

—ঘুমের জন্য কাকে দেখানো যায় রে! ঘুমের ডাক্তার? নাককরা ঘুম-স্পেশালিষ্ট কে আছে? ঘুমোলজি বলে নাকি একটা ডাক্তারি লাইন বেড়িয়েছে? জানিস কিছু তুই?

—ঘুমোলজি? ঘুমোলজিষ্ট! কি বলছিস তুই এসব? দিদি, তোর আর কাণ্ডজ্ঞান হলো না রে! আরে বোকা logy শব্দটা ইংরেজী না? কথাটা হবে

Sleepology ! ভালো বাংলায় 'নিদ্রাতত্ত্ব' বুঝলি ? আজেবাজে কথা বলিস কেন?

— আজে বাজে কথা নয়। মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি অনেক ইংরেজী জার্নাল পড়ে তো! সেদিন বলল, মিস প্রীতিলতা, থুক্কু, মিস্ পৃথুলতা, ঘুমের জন্য আপনাকে আর ভাবতে হবে না। অনিদ্রায় কষ্ট পেতে হবে না। শুনেছি ঘুমোগ্রাফী বলে একটা মেশিন নাকি অলরেডি বেরিয়ে গেছে জাপানে!

— ধ্যাৎ! গ্রাফী শব্দটা ইংলিশ না ? জিনিষটা বোধ হয় Sleepography হবে আমার মনে হয়। Sonography Ultra-sonography, Cardiography আছে না ? এমন আর কি! কী করে যে তুই ব্যঙ্কএ চাকরি পেলি ? আসলে তখনতো তুই এমন ঢাউস্ পিপের মতো ছিলিস না। অনিমেষদার সঙ্গে তখন তোর বেশ লটঘট। আমার আর অনিমেষদার মাঝখানে তোর সীট পড়ল পরীক্ষায়। জামাই ঠকানো যত প্রশ্ন। টিক্-মার্ক আর রাইট্ চিহ্ন, ক্রশ চিহ্ন দেয়ার ব্যাপার তো! আমাদের খাতা টুকলীফাই করে উৎরে গেলি। যাক, এখন বল শুনি, কী কী কাজ করে তোর 'ঘুমতা-ঘুমায়' ঘুমোগ্রাফী না Sleepography মেসিন ?

— অনেক কাজ করে মেসিনটা, এই মনে কর, সারা রাত তুই কতক্ষণ ঘুমুলি, এই ঘুমটুকুর কতটুকু তোর স্বাস্থের পক্ষে কাজে লাগল, ঘাটতি কতটুকু... এসব কম্পুটারে ছাপা হয়ে বেরুবে। স্বপ্ন দেখলি কিনা, কী কী স্বপ্ন দেখলি, কতক্ষণ দেখলি, তার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, পার্শ্বক্রিয়া, এ্যাফেক্ট, সাইড্-এ্যাফেক্ট-আফটার এ্যাফেক্ট-ফিউচার এ্যাফেক্ট এসব...। তো, আমার মতে স্বপ্নটা রেকর্ড না করাই ভালো। আমার ব্যাক্তিগত স্বপ্ন পাঁচকান হবে! ডাক্তাররা হাসাহাসি করবে! লজ্জা-শরম নেই! মানুষের স্বপ্নতো আর সবসময় নির্জলা-নিরামিষ হয় না...

— হ্যাঁ রে! তুই কি এখনো আমিষ স্বপ্ন দেখিস নাকি রে দিদি?

— আমিতো আর তোর মতো বৈষ্ণবী না!

— আমি বৈষ্ণবী! তুইতো ছিলি এলোকেশী। মনে নেই মোহন্ত ধুঁধুল বাবাজীর কথা ? ধঁধুল বাবাজী তোকে ভাঙের শর্বত খাইয়ে...

— ধুঁধুল বাবাজীর কাছে গিয়েছিলাম যোগ শিখতে! বেটা যে এমন নচ্ছার কে জানত !

—এ সব বাজে কথার অর বলবি না! অসুখ বিসুখের কাছে ও সব খাটে না। তো, যা বলছিলাম— পরদিন ডাক্তার এই চার্ট দেখে,ঘুমোগ্রাফ দেখে তোকে অষুদ দেবে... যন্ত্রটা খুব কাজের। সঠিক চিকিৎসা হবে এতে।

— কিনবি তুই ঘুমোগ্রাফী মেশিন্? কেমন দাম? আগরতলায় ডিলার আছে? পাওয়া যায়?

— আগরতলায় এই আধুনিক ঘুমোগ্রাফী? নামই শোনেনি কেউ! মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি একটা বিলিতি জার্নালে পড়েছে শুধু! আগরতলা !! হাসালি তুই!

— তাহলে কোথায় মিলবে, দাম কত?

— জাপানীরা বানিয়েছে! নিশ্চই জাপানে পাওয়া যায়! জাপানী ডলারে সতশো জাপানী ডলার...

— তোর মাথা! গবেট কোথাকার!

— তোর মুণ্ড! তিমিঙ্গিল কোথাকার!

— তোর কপাল! ক্রীষ্টাল গবেট কোথাকার!

— নেই এমন মেশিন, এটাই বলতে চাস তুই?

— মেসিন আছে হয়ত । কিন্তু জাপানী ডলার! কাঁঠালের আমসত্ব। তুই একটা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কএ চাকরী করে বলছিস 'জাপানী ডলার'! ডলার নয়, বোকা! জাপানের মুদ্রাকে বলে ইয়েন্। জাপানী ইয়েন্।

— ইয়েন হোক আর ভিয়েন হোক! সাতশো ইয়েন সমান কত টাকা রে? আমার সঞ্চয়ে কুলোবে তো? নাকি ঘুমোগ্রাফী মেসিন কিনে পেটে কিল মেরে ফুটপাথে পড়ে ঘুমুতে হবে বাবা লোকনাথই জানেন। কত হবে রে, ভারতীয় টাকায়?

— কালকে আমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করব। ফরেন্ কারেন্সির ব্যাপার তো? তোর মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে জিজ্ঞেস কর না?

—বজ্জাতটা চা খেতে চাইবে। দাঁত বার করে কেলাস্ হেসে হেসে বলবে মিস্ পৃথুলাদেবী, থুক্কু, মিস পৃথুলতা, সরি, প্রীতিলতা, আগে জম্পেশ্ করে কড়া 'হাবিল্দার-ভোগ্য' চা খাওয়ানতো এক কাপ করে আমরা সবাইকে।

— আর তুই অমনিই চা খাওয়াবি! এই বদান্যতা করলে, দিয়তাং ভোজ্যতাং করলে দেখিস তোর পরকাল ঝড়্ঝড়ে হবে। মনে রাখিস টাকাই আমাদের

ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-কুটুম। তোমার টাকা না থাকলে, এই আড়াইমণি লাশ, মরলে কেউ ঘর থেকে বার করবে? ছেরাদ্দ হবে তোমার? শাকচুন্নী-পেত্নী হয়ে কষ্ট পেতে হবে না? বুলু পিসির টাকা ছিল না বলেইতো নম নম করে ছেরাদ্দ হল। নিবারণ চক্রবর্তি বলল— 'তোদের পিসির মুক্তি হবে না। তোদের বাবা পঞ্চাশ টাকার বেশী খরচ করতে নারাজ। পঞ্চাশ টাকায় আজকের বাজারে কারো ছেরাদ্দ হয়?' এখন বুলু পিসিকে চালতা গাছে বাস করতে হয়। মনে রাখিস কথাগুলো। চা খাওয়াবি না আর কাউকে। কই, আমিতো কাউকে, আঠারো বছর চাকরি হল, এক কাপ চা খাওয়াইনি! আমার দিন যাচ্ছে না? এই বয়সে একটা না একটা অসুখ বিসুখতো আছেই... দুটো পয়সা বাঁচাতে হবে না?

— ঠিকই বলেছিস। সি.পি.এফ. কনট্রিবিউশনতো আর বাড়াবার যো নেই। রেকারিং করব আরো দুটো। জানিস, কৃষ্ণমূর্ত্তি বজ্জাৎটা মিস্ পৃথুলাও বলবে চাও খাবে। এক বছরেই এ পর্যন্ত দুশো আঠারো কাপ চা খেয়েছে ও আমার নামে। সব ডাইরীতে লেখা আছে আমার। দুশো আঠারো ইনটু এক টাকা পঞ্চাশ কত রে?

— সে আমি এতো রাত্তিরে কি করে বলি! বাম পাশটা আবার আমার...বুঝলি, আমাদের ব্রাঞ্চের শীলাদি বলছিল, শীলাদির বরটা এমনিতেও বামপন্থী ছিলতো... বাম পাশ বাম পাশ করেই টেঁসে গেল বেচারা। দিদিরে! টেঁসে যাব না তো?

— টেঁসবি তুই! হাসালি। সেদিন বড়বৌদি বলছিল— এই খ্যাংড়ির অক্ষয় পরমায়ু। বিয়েতো আর হল না। এখন মানে মানে যদি টেঁসে যেত এই পোরশনটা দখল করতে পারতাম... এসব বলছিল। আরো বলছিল, 'টিস্' থাকলেই মানুষ টেঁসে যায়। তোর নাকি হেপাটাইটিস-সি আরও কত কত ভয়ঙ্কব ভয়ঙ্কর 'টিস' আছে। টিস্ টিস্ করেই নাকি তুই একদিন পটল তুলবি, টেঁসে যাবি।

— হেপাটাইটিস্-সি নয়, হেপাটাইটিস-বি...

— 'বি' থাকলে 'সি' থাকতে পারে না?

— বড়বৌদির ভাইতো ডাক্তার; ও তোকে এক ঝলক দেখেই নাকি বুঝে গেছে রোগটা কী! হেপাটাইটিস্-সি নাকি হেপাটাইটিস্-ডি কি যেন...

—একদিন ডাইনীটা আমাকে সেধে সেধে পোস্তর বড়া খাইয়েছিল রে! সেদিন থেকেই আমার ঘাড়ের ট্রাবলস্টা শুরু! মিঃ কৃষ্ণমূর্তি বলল সেদিন, পোস্ত খেলে নাকি হেপাটাইটিস-পি না কী যেন হয়! হায় রে! হেপাটাইটিসের জার্ম ছিল কিনা কে জানে বড়ায়... হঠাৎ এতো দরদ উথলে উঠল আমার জন্যে কেন?

— আমি বাবা হেপাটাইটিসের হোমিও ভ্যাক্সিন্ খেয়ে নিয়েছি। তুইতো খেলি না। এতো করে বললাম তোকে তখন; শুনলি না!

— হোমিওপ্যাথীর মতো বজ্জাতি আমি বিশ্বাস করি না। যত বাপে খেদানো-মায়ে তাড়ানো বিশ্ব-বখাটেরা ষাট টাকা দিয়ে একটা বই কিনে পড়েই হোমিও ডাক্তার হয়... এক একটা ধুঁধুল বাবাজীরও গুরুদেবের গুরুদেব।

— বলেছে তোকে! জানিস কতো বড়ো বড়ো মানুষ এমনকি প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতিও হোমিও ভোলানাথ বৈদ্যকে দেখান..

— বাদ দে তোর রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী! লোকদেখানো চার টাকার হোমিওপ্যাথি!আসল চিকিৎসাতো সেই বিদেশে... শুনেছি অনেকে নাকি শুধু বিদেশে গিয়ে সরকারী খরচায় চিকিচ্চে করানোর জন্যই খেটে-খুটে মন্ত্রী হয়।

— এক বার বিদেশ গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আসব রে... ইশ রে! শালা! বাম পাশটা বড়ো জ্বালাচ্ছে আজ... মাগো! আজ বোধ হয় টেঁসে যাব রে! শীলাদির কাছে আমার ছশো টাকা পাওনা! টাকাটা আদায় করিস কিন্তু যদি টেঁসে যাই আমি! শালার... আর আমার লুধিয়ানা থেকে কেনা দামী ওলেন সুয়েটারটা, যেটা তুই গতবার হারিয়ে ফেলেছিস ওটার দাম তোকে দিতে হবে না আর। তিনটে ইনস্টলমেন্ট দিয়েছিলিস বোধহয়! এটা নিয়ে তোর সাথে কত ঝগড়া হল! এসব ভুলে যাস। শীলাদির কাছ থেকে ছশো টাকা আদায় করে টাকাটা তুই নিয়ে নিস। যদি টেঁসেই যাই... শালার বাম কোমরটা বুঝলি...

— ছি! তুই ইদানিং এতো মুখ খারাপ করিস না! 'শালা-সম্বন্ধী' বলে গালাগালি করলে তোর ব্যথা কমবে? আসলে তোদের মতো খ্যাংড়া-প্যাংলা বদবেজাজী মেয়েদের একটু মুখ খারাপ হয়... ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বলছিল...

— মার ঝাড়ু তোর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে। শুধু অসুখ বিসুখ থাকলে, শরীরই যদি ঠিক না থাকে মিষ্টি কথা বেরুবে মুখ থেকে?

॥চার॥

Klepto-mania, Klepto- ব্যাধি
তথা ঝম্পন-ব্যারাম ও মোরাদাবাদী পেতলের ঘটি

শ্রীমতি পৃথুলাদেবী কিঞ্চিৎ শিল্পচর্চা করেন। এমন কোন নিন্দনীয় শিল্প নয়, তস্করবৃত্তির একটি শোভন ও মার্জিত সংস্করণ এটি। তাবড় তাবড় প্রসিদ্ধ কলাবিদেরা এটির চর্চা করেন। হাতসাফাই বা হাতটান স্বভাব বলতে রাজী নন এটাকে পৃথুলাদেবী বা তাঁর সহোদরা শ্রীমতি ক্ষীণাঙ্গীদেবীও। এই সূক্ষ্ম ভেলকী-ভোজবাজিটিই পৃথুলাদেবীর একমাত্র শখ বা নেশা। নেশা মাত্রেই হয়ত খারাপ। এ ক্ষেত্রেও এই আপ্তবাক্যের সত্যতা আমরা দেখতে পাব।

— দিদি, আমার বোধ হয় জ্বর এল বলে আবার। কাল ব্যাঙ্কে যেতে পারব তো? গা যে পুড়ে যাচ্ছে রে আমার! টেম্পারেচারটা একটু যদি দেখতে পারতাম! ইস্! একটা থার্মোমিটারও কিনি না কিপ্টেমি করে...

— আছে তো বেশ সুন্দর থার্মোমিটার একটা; ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে।

— কোথায় পেলি রে দিদি?

— বলবি না কাউকে! প্রতিমা ডাইনীসারসের ঘর থেকে বাগিয়েছি।

— দিল তোকে?

— দেবে? এক মুঠো ছাইও সে কাউকে দেয়?

— তাহলে?

— চাইলাম যখন, ডাইনীসারসটা স্রেফ বলল, নেই।

— চুরি করে আনলি শেষমেষ? ছিঃ ছিঃ!

— চুরি করে আনি নি। ঝেঁপে এনেছি!

— ঝেঁপে আনা আবার কি?

— ঝেঁপে আনা মানে ঝেঁপে আনা! ছুঃ মন্তর! কাউকে না বলে আলটপকা স্রেফ তুলে নিয়ে আসা। তাও জানিস না?

— "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।" চুরি করা নাকি মহাপাপ। ভুবনের কথা মনে নেই তোর... সেই দুষ্টু ছেলে, চোর ছেলে ভুবন!

— ঝুমকো মাসির ছেলে ভুবন? সেতো পুলিশ অফিসার! পুলিশ আবার কখনো চোর হয় নাকি?

— আরে না! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা গল্প আছে না, ভুবন নামে একটা চোর ছেলের গল্প...

— বিদ্যাসাগরের ছেলে ভুবন? ছি! ছি!! পণ্ডিতের ছেলে চোর!!

— বিদ্যাসাগরের ছেলে নয় রে, তাঁর গল্পের ছেলে ভুবন! তোর আবার ভুবনের দশা না হয়! সেই যে, মাসির কান কামড়ে ধরে ভুবন বলেছিল— মাসি, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ... গল্পটা পড়িসনি বুঝি মেয়েবেলায়?

— মেয়েবেলার কথা আমার মনে নেই। এছাড়া মেয়েবেলায়তো আমি কোন খারাপ কাজ করিনি যে বুড়িবেলায়ও মনে দাগ থাকবে। মেয়েবেলার কথা আমি মেয়েবেলাতেই ভুলে গেছি।

— তবুও মনে রাখিস, ঝেঁপে আনা আর চুরি করে আনা, সে তোমার একই কথা। আর মুর্খের মতো 'ডাইনীসারস্ ডাইনীসারস্' বলিস কেন? কত বলেছি তোকে, ডাইনীসারস নয়, প্রাণীটা ডাইনোসোরস! আদিম যুগের প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, তিনকোটি বছর আগে...

— আমারতো মনে হয় 'ডাইনীসারস'ই প্রাণীটা। একটা ফিলিম্ দেখলাম না? ডাইনীসারসের, মনে নেই তোর?

— কোনটা?

— সেই যে ইংরেজী সিনেমাটা, জোড়া-শিব পার্ক!

— জোড়া-শিব পার্ক!?

— হ্যাঁ, বিশাল বিশাল ডাইনীসারসের উৎপাৎ নিয়ে ফিলিমটা। জোড়া-শিব পার্কই তো! তাই না?

— আরে বোকা! এই বুদ্ধি নিয়ে তুই কিনা একটা... শিবের কথা আসছে কেন? জোড়া-শিব নয়, জোরাসিক্, জোরাসিক্ পার্ক, Jurasic Park...

— সে একই কথা। আরে, আমি যা বুঝি, ডাইনাসারসের বউই ডাইনীসারস! এত কিছু বুঝি না আমি বাপু! যা ওদের টাকার খাই! দাদাটা একটা ডাইন, তার বৌটা একটা ডাইনী! হল তো।

—তা হোক। কিন্তু, ছিঃ! তোর যে এমন ক্ল্যাপ্‌টোমেনিয়া, আছে জানতাম না। তলে তলে এমন একটা শক্ত ব্যারাম বাঁধিয়ে বসে আছিস!

—শক্ত ব্যারাম?

—হ্যাঁ, ক্ল্যাপটোমেনিয়া...

—ক্ল্যাপ্‌টোমেনিয়া? ওটা আবার কী আজব মেনিয়া? শ্লীপদের চেয়েও শক্ত ব্যারাম নাকি রে?

—শ্লীপদতো নস্যি! ক্ল্যাপটোমেনিয়া শ্লীপদের চেয়েও অনেক গুরুতর ব্যাধি। বিপদজ্জনক আর লজ্জা-শরমের ব্যারাম!

— সত্যি বলছিস?

— সত্যি না তো কী? তোর কি ব্যারামের শেষ আছে! এটাও একটা শক্ত ব্যারাম। হাত-সাফাই ব্যারাম। হাতটান স্বভাব। ছিঁচকে চুরিও বলতে পারিস।

—তুই আমাকে ছিঁচকে চোর বললি! মায়ের পেটের বোনকে তুই ছিঁচকে চোর বললি? তোর জিব খসে যাবে দেখিস! থার্মোমিটারটিতো তোর জন্যেই ঝেঁপে এনেছিলাম! তোরইতো জ্বর-টর বেশী হয়। তাই না? তুইই আমাকে চোর বললি? এতো নেমকহারাম তুই! যার জন্যে চুরি করি সেই কিনা বলে চোর!

— আমি তোকে সেই অর্থে চোর বলিনি। ক্ল্যাপ্‌টোমেনিয়া তেমন খারাপ ব্যারাম নয় রে! অনেক । বড় বড় খানদানি মানুষের এটা থাকে।

— বলছিস? বড়ো বড়ো লোকেদের এ ব্যারামটা থাকে?

— থাকে। ফিলিম্ ষ্টার দিগ্বসনা দেবীর কথা শুনিস নি বুঝি?

— দিগ্বসনা দেবী! Nil-বসনা দেবীর বোন?

—হ্যাঁ রে! দিগ্বসনা দেবীরও আছে এ রোগটা। তাঞ্জানীয়া না উগাণ্ডায় গিয়ে এক হোটেলের একটা ন্যাপকীন চুরি করে ধরা পড়ে ছিলেন। শেষতক আদালতে কেস্ গড়ায়। হাকিম অবশ্য দিগ্বসনা দেবীর দিকে চেয়ে, শুধু দিগ্বসনা দেবী বলেই তাঁকে শুধু দৃষ্টিশাসন আর তিরস্কার করে ছেড়ে দেন।

— শুধু তিরস্কার? জেল-জরিমানা-হাজতবাস কিচ্ছু না?

— না। তিরস্কারও সে তোর সামান্য ন্যাপকীন চুরির জন্য নয়! হাকীম ভেবেছিলেন দিগ্বসনা দেবী বুঝি পুরোপুরিই দিগ্বসনা! তাঁকে স্বল্পবসনা দেখেই

নাকি হাকীম রেগে মেগে তিরস্কার শুরু করেন। আর... বিবাহ-বিলাসিনী অভিনেত্রী সরলরেখা দেবীওতো একবার পাঁচ-সিকে দামের একটা নেক-টাই ঝেঁপে এনে ছিলেন। কিন্তু এনেই হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর কত বড়ো ভুল করে বসে আছেন। এ মাসের ডিভোর্স করা হয়েছিল ঠিক ঠিকই অথচ ব্যাস্ততায় বিয়েই করা হয়নি। কাণ্ড দেখ! একটাও স্বামী মজুদ নেই ঘরে, তো নেক-টাই পড়বে কে?

— সব্বোনাশ! তারপর?

— তারপর, টাইটা ফেরৎ রেখে ভাবলেন একটা লিপস্টিক ঝেঁপে নিয়ে আসবেন ঐ দোকান থেকেই! ব্যাস্! লিপস্টিক আনতে গিয়ে বামাল ধরা পড়লেন। যথারীতি এ কেস্‌টাও আদালতে গড়ায়।

— সরলরেখা দেবীও তিরস্কৃত হলেন?

— না, না। হাকীম এ ক্ষেত্রে সাড়ে তিন ডলার ফাইন করতে যাচ্ছেন দেখে আচমকা সরলরেখা দেবী ঐ হাকীমকেতো এজলাসেই বিয়ে করে বসলেন। অগত্যা মহামান্য আদালত চক্ষুলজ্জার খাতিরে আর সাহেবী সৌজন্য বশতঃ তাকেও তাঁর সরলতার জন্য ছেড়ে দিলেন। ব্যাস্, মুশকিল আসান, ঝামেলা পাইখা...

— সরলরেখা দেবী স্বামী নিয়ে শ্বশুড়-বাড়ি চলে গেলেন বুঝি?

— লবডঙ্কা! আদালত থেকে বেড়িয়েই হাকীমটাকে ডিভোর্স দিয়ে দিলেন। সে যাত্রা সাড়ে তিন ডলার বেঁচে গেল তাঁর একটা বিয়ে করে। পড়িসনি বুঝি খবরটা 'তারকাবিলাস' ম্যাগাজিনে?

— আরো কার কার আছে রে ঝাঁপন-ব্যারামটা? তুইতো কতো কিছুর খবর রাখিস! ডবল মেগা-ষ্টার খঞ্জর খানের নেইতো রোগটা? দেখিস আমি আবার খঞ্জর খানের 'ফ্যোন্' কিন্তু!

— খঞ্জর খানের নেই। ঐতিহাসিক কোন খঞ্জর টঞ্জর পেলে হয়তো তিনি ঝেঁপে আনতে চাইবেন। আপতত এমন কোন তথ্য কাগজ-ওয়ালাদের কাছে বোধ হয় নেই। তবে ক্রিকেটার বাহারউদ্দিন ছক্কাসই আর মিঃ বাউণ্ডারীলালের আছে! আর পলিটিশিয়ান, মন্ত্রী ধুরন্ধরলাল দণ্ডপ্রসাদ যাদব, তাঁরও নাকি আছে...

— কোন ধুরন্ধরলাল যাদব? পশু-মন্ত্রী মিঃ দণ্ডপ্রসাদের কথা বলছিস?

— পশু-মন্ত্রী নয়, পশু-পালন মন্ত্রী!

—একই কথা হল! তা মাননীয় পশু-মন্ত্রী কী বস্তু ঝেঁপে ছিলেন রে?

— সেইতো, সুইজারল্যাণ্ড না কোথায় পশু-খামার পরিদর্শন করতে গিয়ে, পশুদের সাথে বাতচিত আলাপ-পরিচয়ের ফাঁকে, এক বিদেশী বাছুরের গলার একটা দেহাতি পেতলের ঘন্টি ঝেঁপে আনতে চেয়েছিলেন। ভাবছিলেন হয়ত নিজের গোয়ালের প্রিয় থার্পাকার ক্রস-ব্রীড্ বাছুর ছবিলিরাণীকে হোলির সময় একটা বিদেশী উপহার দেবেন! কিন্তু বিদেশের মায়েরা ছেলে-মেয়ের প্রতি খুব মনোযোগী হয় তো! তাই মিঃ দণ্ডপ্রসাদ যাদব, সেই বাছুটির মায়ের চোখ এড়াতে পারলেন না। গুঁতিয়ে দিল তাঁকে প্রচণ্ড! খানায় পড়ে একটা পা ভেঙ্গেই গেল। সরকারী খরচায় দেশে বিদেশে কত যে চিকিচ্যে করলেন! কিছুতেই সুস্থ হলেন না। মিঃ দণ্ডপ্রসাদ এখন দণ্ড হাতে নিয়ে, স্ত্রীর কাঁধে ভর করে চলেন।

— তা হলে বলছিস ব্যারামটা একেবারে খারাপ নয়? তাও আবার ভদ্রলোক, বড়োলোকের ব্যারামই!

— হ্যাঁ রে, দিদি! তোর এই ঝম্পন-ব্যারামটাতো বেশ গাঢ়ই মনে হচ্ছে! তা কি করে ঝাঁপ মারিস তুই, কেউ দেখে টেকে না?

— আরে ঝেঁপে আনা কি এত সোজা! ধর, কারো বাড়ি বেড়াতে গেলি। তোকে চা দিল। চায়ের কাপ-ডিশ জোড়াটা তোর পছন্দ। খাটি বোন্-চায়না, পোর্সিলিনের নকশাদার ফাইন্ কোয়ালিটির মাল। তো, অপেক্ষা কর। সন্ধের দিবে হলে ভালো হয়। জানা কথা, সন্ধের দিকেতো লোডশেডিং হবেই। যতক্ষণ না হয়, আগড়ম-বাগড়ম গল্প চালিয়ে যা। যেই ঝপ্ করে আলোটা চলে যাবে, তুইও মালটা ঝেঁপে নিয়ে কেটে পড়বি। কয়েদিন আর ও বাড়ির পাশ মাড়াবি না। এই যে রূপোর নস্যি দানিটা, অ্যাশ-ট্রেখানা, গণ্ডারের হাড়ের চিরুণীখানা, ইভেন্ একটা হাভানা টোবাকো পাইপ সবইতো আমি ঝেঁপে আনলাম রে!

— আরো কতো টুকিটাকি, একটা ছোট ষ্টিলের কাটারী, চন্দন কাঠের ছোট একটা পিঁড়ি আর তামার তৈরী গাঁজার কল্কে, হাবিজাবি কত কিছু! ওগুলো সব ঝেঁপে আনা বোধ হয়, না রে? এই বাজে জিনিষগুলো কেন জড়ো করেছিস?

— বাজে জিনিষ কোথায় রে! ষ্টিলের কাটারী কী বলছিস? ওটাতো রীতিমতো পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান, বিখ্যাত 'রতন-কাটারী'!

— রতন-কাটারী?

— হ্যাঁ! 'রতন-কাটারী' চিনিস না? পরশুরামের রতন-কাটারী আর প্রেম-তক্তি! রতন-কাটারী দিয়ে গাঁজা কাটা হয়, প্রেম-তক্তিতে ফেলে কুচি কুচি করে। চন্দন কাঠের পিঁড়িটাই হল, যার নাম 'প্রেম-তক্তি'! ছোটলোকের মতো গাঁজার কল্কে বলতে নেই। এটা সিদ্ধাই উপকরণ, এটাইতো 'সাধন-কল্কি' সেই মহেঞ্জোদরোর আমলের! ঈশ্বর লাভের জন্য যদি কোনদিন সাধনা করিস, মাতাজী-টাতাজী হতে চাস, এসব সামগ্রী তোর দরকার হবে। এগুলো অনেক কসরৎ করে আমাদের বহু পুরনো কাষ্টমার শিউপ্রসাদের ডেরা থেকে ঝেঁপে এনেছি।

— তা বুঝলাম! এগুলো তোর কি রাজকার্যে লাগবে রে দিদি?

— তুই একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট হয়ে এ কথা বলছিস? 'রতন-কাটারী'টার গায়ে লেখা আছে, Made in Germany, 1650. তার মানে আড়াইশো বছরের পুরনো এন্টিক মাল। সমান্য জিনিস? আর 'প্রেম-তক্তি'টা? এমন চন্দন খাঁটি কাঠ চন্দন-দস্যু বীরাপ্পনের কাছেও নেই। জানিস আড়াই হাজার টাকা কিলো চন্দন কাঠ! বাকি রইল তোর 'সাধন-কল্কে'টা! এটার গায়ে কতযে দুর্বোধ্য ভাষায় কত কিছু লেখা আছে! কত হাজার বছর ধরে কত সাধক এই প্রাগৈতিহাসিক 'সাধন-কল্কে'য় 'বড়-তামাক' মানে গাঁজা টাজা খেয়ে সিদ্ধি লাভ করেছে কে জানে! শিউপ্রসাদের পরদাদার পরদাদা নাকি এ সব অমূল্য জিনিস ব্যাবহার করতেন।

— ভালো, ভালো! এদ্দিনে একটা ভালো ব্যারামে ধরল তোকে তাহলে!

— থ্যাঙ্ক ইয়ু! বুঝলি যা হোক! এদ্দিনে অন্তত একটা ভালো ব্যারাম হল আমার যাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কি বলিস?

— ক্ষতি নেই? ধরা পড়লে ক্ষতি নেই বুঝি?

— অবশ্য পটের বিবি ডাইনীসারস্ প্রতিমার হাতে ধরা পড়লে মুশকিল হতো। হয়তো আমাকে ফঁসিই দিত বিদ্যেসাগরের ছেলে ভুবনের মতো! তুই কী বলিস, তা হলে কি ব্যারামটার চিকিচ্চে করাতে হবে?

— ক্ল্যাপ্টোমেনিয়া, তস্করব্যধির চিকিৎসা করানো চাট্টিখানি কথা নয়। বড়ো বড়ো তালেবর লোকেরা বিদেশ গিয়ে ডাকসাইটে সাইকিয়াট্রিষ্ট দিয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে চিকিৎসা করায়। তিন টাকার ন্যাপকিন্ চুরি করে আর তিনকোটি টাকা ডাক্তারের খরচা দেয়! পারবি তুই?

— লে! এত টাকা কোথায় পাব? তার চ্যে বরং থাক না রোগটা। ক্ষতি কি? এই সুযোগে ডাইনীসোরসটার ঘর থেকে আরো দুটো জিনিষ ঝেঁপে নিয়ে আসি। কাজে লাগবে। ঠাকুর! এ রোগটা অন্তত আমার কিছুদিন থাকুক! মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তির একটা স্ফটিকের সুন্দর গণেশ মুর্ত্তিআছে! আমার খুব পছন্দ। চাইলাম, দেবে না বলল। দেখি ঝেঁপে আনতে পারি কি না! এই স্ফটিকের গণপতিযার কাছে থাকে, টাকা পয়সারও কোন অভাব থাকে না। তার নাকি কোন ব্যারাম, রোগবালাই হয় না, বুঝলি? গত বারোটি বছর ধরে দেখছি, মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তির একটু সর্দি-গর্মিও হয় না। শক্ত ব্যারামতো দূরের কথা।

— আর কী কী ঝেঁপে আনার মতলব তোর?

— কাজের জিনিষই আনব। মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তির ডাক্তার ভাইয়ের সেই বিলিতি স্টেথোস্কোপটা আর প্রেসার মাপার যন্ত্রটা। নানান রোগ-বালাইতো লেগেই আছে! রাত-বিরেতে প্রেসারটা মাপতে পারব, হার্টের খবরাখবর রাখতে পারব। যে ভাবে টপাটপ হার্টের ব্যামোতে মানুষ টেঁসে যাচ্ছে! স্টেথো-গলায় যে কোন একটা হাভাতে আনাড়িকেও যদি ডাক, একশোটি টাকা ভিজিট্ গুণতে হবে। তার চ্যে যন্ত্রগুলো কাছে থাকলে প্রাথমিক চিকিচ্যেটা করা যাবে অন্তত!

— আর কোন বিশেষ ঝম্পন-বিলাস আছে তোর?

— থাকবে না কেন? একদিন চল না আমার সাথে খোসমহলের ওদিকটায় শিউপ্রসাদ-ছগনলালের আস্তানায়। তবে শীগগীরই ঢুঁ মারতে হবে ওদের ডেরায়। কারো নজরে পড়লে আবার আমার আগেই না ঝেপে নেয় মালটা! এসব অমূল্যধন ফেলে রাখা যায় না। ওরা কি এসবের মর্ম বুঝে?

— সব্বোনাশ! ওদের ঘরে হানা দিবি তই? কী সম্পদ আছে ওদের?

— শিউপ্রসাদদের সেই মোরাদাবাদী পেতলের ঘটিখানা ঝেপে আনব।

— হায় রে! বাবা লোকনাথ!! শেষপর্যন্ত সিঁধেল চোরের মতো মানুষের হেঁসেলে হানা দিয়ে ঘটি-বাটি-হাতা-খুন্তি চুরি করবি তুই?

— চুরি নয় রে! ছুঁ-মন্তর ঝেপে আনব।

— ঝেপেই বা আনবি কেন? কত টাকা দাম হবে একটা ঘটির? আর আজকাল কেউ সেকেলে ঘটি-লোটা ব্যাবহার করে?

— আরে তুই বুঝিস না কেন? এ পেতলের ঘটি মোরাদাবাদী অ্যান্টিক জিনিস। খাস খাগড়াই পেতলের তৈজস। দুশো বছরের পুরনো। সাড়ে তিন সের ওজন। হুসেন শাহ্ না কি শের শাহ্ কে যেন 'গিরবি' রেখেছিল ওটা শিউপ্রসাদের পরদাদার পরদাদার কাছে সাড়ে ছ'আনা পয়সা আর আড়াই মণ গেঁহুর বিনিময়ে। পয়সার অভাবে হুসেন শাহ্ না কি শের শাহ্ সুদ-আসল মিলিয়ে আড়াই হাজার টাকা শোধ করে আর উদ্ধার করে নিতে পারেনি এই মোরাদাবাদী পেতলের ঘটি।

— তবুওতো এ সামান্য ঘটিই একটা!

— সামান্য নয় রে! কী সুন্দর নক্সা আর কারুকাজ! দেখলে তোরই লোভ হবে। একদিন চল আমার সাথে শিউপ্রসাদদের ডেরায়। দুজন একসাথে গেলে মালটা ঝেপে আনতে সুবিধে হবে।

— হাসালি তুই দিদি! কী করে আনবি রে মালটা?

— সেটাইতো মহা সমস্যা। এক পলকের জন্যও হাতছাড়া করে না এই ঘটি ওরা। সারাদিন হাতে হাতে থাকে ওদের মোরাদাবাদী বাদশাহী ঘটি।

— পাহারা দেয় ওরা ঘটিটি সারাক্ষণ? না কি ভিক্ষে করে মোরাদাবাদী ঘটি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায়?

— ভিক্ষে করবে কেন? ঠেলাওয়ালা-মুটে-মজুর হলেও ওরা বড়লোক। ওদের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আমাদের ব্যাঙ্কএ জমা আছে।

— তাহলে সারাদিন ঘটি আগলে বসে থাকে ওরা?

— না। ঐ একটাই ঘটিতো ওদের! এক ঘরে ওরা ছাব্বিশ জন কিরায়াদার প্লাস দুচার জন দেশোয়ালী মেহ্‌মান। প্রত্যেকের 'পানি' পান করা, দারু-তাড়ি গেলা, সেই একই ঘটি ভরসা ওদের। তারপর ম্যারাথন টাট্টি যাত্রা!

— 'রাম-যাত্রা' দেখেছি। টাট্টি-যাত্রাটি আবার কেমন যাত্রা রে?

— টাট্টি-যাত্রা মানে 'বড়-বাইরে' বা টয়লেট-বাথরুম যাওয়া আর কি!

— সারাক্ষণই ওরা টাট্টিতে গিয়ে বসে থাকে না কি?

— প্রায় তাই! শুধু কি ছাব্বিশ জন কিরায়াদারের অহরহ টাট্টি গমন? আছেন প্রতিষ্ঠিত উপাস্য দেবতা 'পওন-কুমার' অর্থাৎ পরমারাধ্য শ্রীশ্রী বীর হনুমানজী! তাঁর তিনি বেলা সেবার জল সংগ্রহ করা! সেও তোর ঐ মোরাদাবাদী

ঘটিই সম্বল। রাতদিন, উদয়াস্ত মোরাদাবাদী ঘটির আর বিশ্রাম নেই।

— রাতদুপুরে হানা দিতে হবে তোকে। চাই কি সিঁধও কাটতে হতে পারে! রীতিমতো ক্রিমিন্যাল্ অফেন্স, পুলিশী ভাষায় বার্গলারী যাকে বলে।

— রাতদুপুরেও কোন সুবিধে হবে না।

— কেন সুবিধে হবে না?

— গভীর রাত পর্যন্ত ওরা এই মোরাদাবাদী ঘটিতে কাহারবা, তিনতাল, খেমটা-আড়খেমটা বাজিয়ে রামধুন,কাওয়ালী গায়। 'ভোজপুরী বির্হা' 'ভজন-দোঁহা-কাজরী-হোরী-চৈতী' আর পাটনাই 'চালিশা' গায়। ভোর রাত থেকে আবার রিলে-টাট্টি-যাত্রা, টাট্টি-তাড়না শুরু। মুশকিল হল, ঐ একটাই পেতলের ঘটি তো! আর রাতদিন ওদের যেই তাড়না! ওটি হাতানো, ওদের হাত থেকে ঝেঁপে আনা সোজা কথা নয়!

— ছিঃ তোর নজর এতো নীচু? না, না। ছগনলাল ওরা আমাদের কতো উপকার করল আমার যখন জণ্ডিস্ হল! দয়া কর। ওদেরকে অন্তত তুই রেহাই দে। ওদের পিতৃপুরুষের ধন, এই খানদানী ঘটি! না জানি কত পুরুষধরে ওদের টাট্টি-সঙ্গী আর সান্ধ্য-বিনোদনের উপকরণ এই লোটা! ওরা তোর ব্যাঙ্ক'এর এতদিনের কাস্টমার! ওদের টাকায়ইতো তোর বেতন হয়। অধর্ম করিস নে। দোহাই তোর, দিদি, শিউপ্রসাদেরা বড়ো শোক পাবে, এমন কাজ করিস নে। মথা ঠাণ্ডা কর। নে, এখন একটু ঘুমুনো যায় কিনা দেখ! কাল আপিস্ যেতে হবে না?

ডক্টর মিস্ পৃথুলা ও ডক্টর মিস্ ক্ষীণাঙ্গীদেবীরা ঘুমের জন্য আর আরাধ্য দেবতাকে ডাকেন না। আয় ঘুম যায় ঘুম বা ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি এসব মন্ত্রও উচ্চারণ করেন না। ডেল্ কার্ণেগী পড়েন না। ভেড়াও গুণেন না। ভেলিয়াম-১০ও খান না। দেবতা ও নানান বাবাজী মাতাজীদের থানে-মন্দিরে-ডেরায়ও যান না। দেবতাদেরও যে দোষ নেই এটা তাঁরা বুঝেন। বুঝেন, দেবতার বয়স হয়েছে হয়তো তাঁদের মতোই। প্রায় সারা রাতই হট্টি-টি-টি পাখীর মতো পায়ের উপর পা তুলে বিছানায় পড়ে থেকে আধি-ব্যাধি-ব্যারাম-বালাই নিয়ে গবেষণা, আলোচনা ও বিতর্কে রাত কাটিয়ে দেন।

ঘুমরে বদলে ঘুমোলজি, ঘুমোগ্রাফী আর নিদ্রাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কে রাত কাটে তাঁদের। আলোচনা ক্রমে বিতর্ক, বিতর্ক থেকে বিতণ্ডা ও বিতণ্ডার পরিণতি মান-অভিমান। পরিণামে ক্লান্তি। অবসাদ ও ক্লান্তি থেকে কায়া-ঘুম, বেড়াল-ঘুম পলকা ঘুম। বায়ুসেবী প্রতিবেশীদের কোলাহলে পলকা ঘুমও এক সময় টুটে যায়। যথারীতি নিত্যকর্মও তারা করেন। কেউ পাখীর আহার কেউ কুম্ভকর্ণের ভোজন সেরে দিনগত-পাপক্ষয়ের মানসে কর্মস্থলে পা বাড়ান দুই বয়স্থা প্রায় বিগত-যৌবনা ব্যারামবিলাসিনী কুমারী।
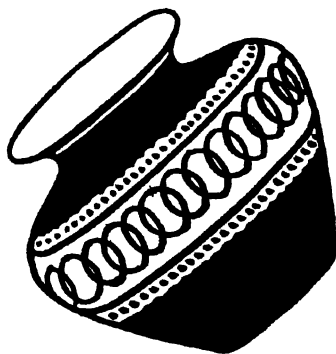
ম্যারাথন টাট্টি-যাত্রা, গম্ভীর রাত্রির সঙ্গীত চর্চা, রামধুন-ভোজপুরী বিরহা ও শ্রীশ্রী হনুমানজী'র নিত্য সেবার জল আহরণ সব ব্যাপারেই অত্যাবশ্যক তৈজস 'মোরাদাবাদী পেতলের ঘটি'।

আধা-সরকারী গাধার গল্প

সতর্কীকরণ

মহামান্য আঁতেলগণ, যাঁহারা মদ্য পানের জন্য
পদ্য লেখেন বা পদ্য লেখার জন্য মদ্য পান করেন; বিবস্ত্র না হইয়া
তুলিতে রঙ লাগান না, মহামান্য মহাত্মাগণ, যাঁহারা
সরকারী দপ্তরে কর্ম করেন অথচ ঘোড়ার ঘাস কাটিতে জানেন না,
তাঁহারা আধা-সরকারী গাধার গল্প' পড়িবেন না।

আধা-সরকারী গাধার গল্প

মঙ্গলাচরণ

"হে গর্দভ! বিধাতা তোমাকে তেজ দেন নাই, এই জন্য তুমি শান্ত; বেগ দেন নাই, এজন্য তুমি সুধীর, (ধন্য, ধন্য! 'ব্যারামবিলাস ও অন্যান্য গল্পকথা' পুস্তকের অখ্যাত লেখক!) বুদ্ধি দেন নাই, এ জন্য তুমি বিদ্বান; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এ জন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি; ঘাস খাইয়া সুখী হও! বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দভ মোট বহিবে কেন! পরিশ্রমে যদি (উদরপূর্ত্তি) হইত, তবে বাঙ্গালী বাবুরা কেরাণী কেন?" — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
('লোকরহস্য' সংসদ প্রকাশিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১১. ৫৬।)

অনুভাগ-১

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গাধার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। গাধাকে তিনি অবজ্ঞা করেন নি। গাধার গুণ-কীর্ত্তনে 'গর্দভ' শিরোনামে আস্ত একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। বোদ্ধা পাঠক পড়েছেন, বুদ্ধিমান পাঠক না পড়েও হয়ত সবই জানেন; কৌতুহলী উৎসাহী নবীন পাঠকপড়ে দেখতে পারেন। বঙ্কিম-বাণীকে (বাঁকা কথা!) শাস্ত্রবচন হিসেবে শিরোধার্য করেই বড়োবাবু ও গর্দভ কথার উপক্রমণিকা বা মঙ্গলাচরণ হিসেবে আমরা তাঁকে স্মরণ করলাম।

স্বয়ং সম্রাট যেখানে গাধাকে 'সুধীর' বলেছেন তারপর কোন গাধার মনে, বিশেষ করে বাঙালী গাধার মনে আর কোন ক্ষোভ থাকতে পারে না। একজন উচ্চশ্রেণীর আমলা, কর্ম-বিমুখ, নিরুদ্যম ভেতো বাঙালী বাবুকে কেরানি বা গাধার সমগোত্রীয় বলেছেন! নিশ্চই ভেবে চিন্তে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেই বলেছেন। আসলে মহৎ ব্যাক্তি ছাড়া গাধার মর্যাদা কেউ দিতে পারেন না। বড়োবাবু ও কয়েকটি গাধার গল্পের ভূমিকা একটু দীর্ঘ না করে আমাদের উপায় নেই। সুধীর (বঙ্কিম অর্থে নয়), সুশীল পাঠক একটু ধৈর্য্য রাখবেন এমনটি আশা করি।

বিদূষী ললনা শ্রীমতি কল্যাণী দত্ত যে দু'তিন খানা হালকা অথচ ওজনদার পুস্তক লিখেছেন তারমধ্যে 'অষ্টরম্ভা' অন্যতম। গাধার সাতকাহণ তিনি শুনিয়েছেন আমাদের। গাধার গুণাবলী কীর্তন ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি, গাধা সম্পর্কে বলার আর কিছুই বাকি রাখেননি। খ্রীষ্ট জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্বে, মিশরের রাজা ও নাগরিকদের কাছে গাধার খুব সম্মানজনক স্থান ছিল। তার ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এতে ইতর প্রাণী গাধার অবস্থার খুব একটা ইতর বিশেষ উন্নতি হয়নি। আজও বুদ্ধিমানের বিপরীত দিকেই গাধারা অপাংক্তেয়, অচ্ছুৎ।

গাধা সম্পর্কে আমাদের সমাজ বরাবরই অনুদার ও উন্নাসিক। সাহিত্যিক ও গল্পকারেরা গাধাকে সভা-সুন্দরের মোট-বাহক হিসেবেই শুধু চিহ্নিত করে গেছেন। বুদ্ধিহীন ভারবাহী জন্তু হিসেবেই তাঁরা গাধাকে উপহাস করে গেছেন। অথচ, দেখুন, মোল্লা নাসিরুদ্দিনের মতো রসিক ব্যাক্তি তাঁর প্রিয় গাধাটির প্রশংসায় কতো উদার! গাধা মোটেই পরিশ্রমবিমুখ নয়— বঙ্কিমচন্দ্র বললেও নয়! এই যে আফগানিস্তানে এতো বড়ো যুদ্ধটা চলছে, যে পক্ষই জয় লাভ করে, এই ঊষর ভূমিতে একমাত্র সর্বত্রগামী বাহন গাধাদের কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবেই।

পণ্ডিতরা চিরকালই গাধাদের অবজ্ঞা করে এসেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, পণ্ডিতের বিপরীতার্থক শব্দটিই, যতটুকু আমার মনে পড়ে, পরীক্ষার খাতায় আমি লিখেছিলাম 'গাধা'। 'মুর্খ' আর 'গাধা' সমার্থক হলেও, পণ্ডিতেরা গাধাকে তাঁদের বিপরীত মেরুতেও স্থান দিতেনারাজ। পণ্ডিতমশাই গাধার বিপরীতার্থক শব্দ 'পণ্ডিত' অথবা পণ্ডিতের বিপরীতার্থক শব্দ 'গাধা' এটা মেনে ছাড়পত্র দিতে ছিলেন গররাজি। যথারীতি গাধা আমারও এ জীবনে বিদ্যালাভ হয়নি। ব্যাক্তিগত প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা বরং গাধাকেই নিয়েই টিকিস্ টিকিস্ এগিয়ে যাই।

করুণাময় প্রভু যিশু নাকি বলেছেন, গাধাদের বিশেষ যত্ন করার জন্য, গাধাকেও তার প্রাপ্য দেয়ার জন্য। কিন্তু গাধারা যে ন্যায় বিচার পাচ্ছে না তার প্রমান এই ব্যার্থ লেখক। তবুও শ্রীমতি কল্যাণী দত্তের মতো স্নেহপরায়ণা কেউ

গাধার প্রশংসা করলে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি; নূতন করে বাঁচার প্রেরণা পাই। কারণ, আজন্ম শুনে আসছি এই প্রাণীটির সঙ্গে আমার নিবীড় সাদৃশ্য-সাযুজ্যের কথা। মনে পড়ে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি জ্ঞানবীর বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই অমূল্যচরণ চক্রবর্তীর কথা। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, আমার রাসভসুলভ প্রকৃতির জন্য। বলতেন আমার ভাবলেশ-হীন চাউনি নাকি ঠিক গাধার দৃষ্টির মতো। অধিকন্তু সব বিষয়ে নির্বিকার আমাকে আদর করে ডাকতেন 'রাসভলোচন'।

গাধা সম্পর্কে একবার তিনি একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করতে বলেন। আমার সতীর্থরা অনেকেই তাদের অমূল্য রচনা যথা সময়ে অমূল্যচরণ পণ্ডিত মশাইর চরণে জমা দেয়। তার থেকে পণ্ডিতমশাই শুধু আমার খাতাটি বেছে নেন। পড়ে শোনান সবাইকে, আমার একটিই শুধু বাক্য— 'আত্মপ্রচার ভালো নয়। নিজের সম্বন্ধে আমার কিছু বলার বা লেখার নেই। আত্মজীবনী রচনা খুবই কঠিন, সহজ কাজও নয়।'

অনুভাগ-২

এক গাধা আর চাঁদ নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে বনের মধ্য দিয়ে,
কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।
এভাবে, এককালীন সঙ্গে যাওয়ার নাম,
তোমরা দিয়েছ ভালোবাসা।
— শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

উদ্ধৃতি দেয়া একটি রোগ। তবে এমন সুন্দর পংক্তিগুলো উদ্ধার না করেও পারছি না। আমার আপনার প্রিয় কবি শক্তি। শক্তির গাধা আর চাঁদ। তাদের যে যার মতো 'এককালীন' হেঁটে যাওয়া! এরই নাম ভালোবাসা। তবুও বলবেন গাধারা অপাংক্তেয়, গাধারা বোকা, অচ্ছুৎ নিতান্তই গাধা? Horse-power, অশ্ব-শক্তিই শক্তি, Ass-power, রাসভ-শক্তি বুঝি শক্তি নয়?

ভূমিকা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। আমরা গাধার গল্প বলব এমনি কথা ছিল। আমাদের গাধার গল্পে সবই আছে একমাত্র আসল গাধা ছাড়া। অনুপম একটি প্রাগৈতিহাসিক সরকারী দপ্তরের নবীন করনিক। করনিক জীবনের অনেক প্রথা-লোকাচার-ব্যাবহার-বিধি-আচার-আচরণ-শাস্ত্র-শরিয়ত এখনো তার রপ্ত হয়নি। তিনজন ঘুমন্ত করনিকের মাঝে নিদ্রাহীন অনুপম একটি ইংরেজী থ্রিলার পড়ছিল বসে বসে। এমনই সময়ে শ্রীমতি শীলা বা শী(ত)লা দাস, ব্র্যাকেটে ভট্টাচার্য, সদ্য মধ্যাহ্নের ভোজন সেরে এসে সীটে বসেন। একটি ৬৪-ডেসিবেলের বেশী ওজনদার সশব্দ উদ্গারকর্ম করে অনুপমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—

— অনুপম, মেচ্ হবে ভাই?

— কার সাথে আর ম্যাচ্ হবে আমার? কারো সাথে ম্যাচ করতে পারব না আমি এই জীবনে। তো, আপনি বুঝি ঘটকালিও করছেন আজকাল?

— ঘটকালি করব কেন? Matchbox, matchstick হবে?

— ও! দেশলাই? সে কথা বলুন!

— দেশলাইকেই আমরা আগরতলার মানুষ, কাঠ-বাঙালেরা মেচ্ বলি।

তুমি কি বিলেত বা আফ্রিকা থেকে এলে নাকি, অনুপম?

— শীলাদি আপনি বিলেত গেছেন?

— না! যাইনি। তুমি বোধ হয় গিয়েছিলে...

— আমিও যাইনি! তবে এটা জানি বিলেতের লোকই দেশলাইকে 'ম্যেচ' বলে। আমি ভাবলাম আপনি আবার বিলেত গেলেন কবে!

— সোজা কথার সোজা জবাব জান না তুমি! এ জন্যেই তোকাকে কেউ পছন্দ করে না। এতো এতো মেয়ে এই অফিসে, কেউ ফিরেও চায়না তোমার দিকে। যাক, মানলাম তোমার কথাই। 'যাহাকে মেচ্ বলে তাহাই দেশলাই।' সামান্য কথাকে কেমন জটিল করে নিতে পার তোমরা! মেচ, থুড়ি, দেশলাই আছে তোমার?

— দেশলাই না থাকলেও আপনার জন্য কিনে আনব আমি। আগে বলুন, আপনি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নেশা করেন কেন?

— নেশা করি আমি? আমি মাতাল, মদখোর!!

— মদ খেলেই শুধু নেশা করা হয় না। কত রকম নেশাইতো আছে। আমি বলছিলাম আপনি এত কিছু থাকতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নেশা করেন কেন?

— দ্বিতীয় শ্রেণীর নেশা? কী বলছ এসব? আমার মনে হয় তুমিই আজ দু'পাত্তর চড়িয়ে এসে অফিসে বসেছ! কী খেয়েছ তুমিই জান! তাড়ি না ধেনো! বাংলা না ককবরক কে জানে! কী যে বল তুমি! তোমার সাথে কথা বলাই ঘাট! নেশার আবার শ্রেণী বিভাগ, শ্রেণী-সংগ্রাম হাবিজাবি...

— হ্যাঁ! শ্রেণী-বিভাগতো আছেই। প্রথম শ্রেণীর নেশাখোর বিড়িও কেনে না, দেশলাইও কেনে না। অথচ বিড়ির নেশাটি করে পাক্কা! দ্বিতীয় শ্রেণীটাই আপনার মতো। বিড়ি কিনলে দেশলাই কিনবে না, দেশলাই কিনবে তো বিড়ি কিনবে না। অথচ নেশাটি করে পাক্কা! আর থার্ডক্লাশ বা তৃতীয় শ্রেণীর নেশাখোর, এরাই ভদ্রলোক, বোকার মতো বিড়িও কিনবে, দেশলাইও কিনবে। অথচ নেশাটি জমে না। জমে না, কারণ আপনাদের মতো দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর নেশারুদের উৎপাতে। শীলাদি আপনি বোধ হয় জানেন, আমি বিড়ি খাই না। না কি ভেবেছিলেন হয়তো আমি তথাকথিত তৃতীয় শ্রেণীর নেশাখোর? বিড়ি কিনতে পারেন, সামান্য পঞ্চাশ পয়সায় একটা দেশলাই থুড়ি, মেচ্ কিনতে পারেন না?

— কী আবোলতাবোল কথা বলছ? ছিঃ ছিঃ! আমি বিড়ি খাই?

— কেন, বিড়ি খাওয়া বুঝি খারাপ?

— জঘন্য! খারাপ নয় তো কী?

— বিড়ির প্যাকেটে কোথাও লেখা আছে এ কথা? যেমনটি সিগারেটের বেলায় থাকে Cigarette smoking is injurious to health? বিড়ি খাওয়া খারাপ!? আপনিতো কাব্য-কবিতাও পড়েন শীলাদি...

— কবিতা পড়লেই বিড়ি খেতে হয়? বলতে হয় বিড়ি খাওয়া ভালো? আধুনিক কবিদের মতো, রিক্সাওয়ালার মতো, মাতাল মদখোরের মতো বিড়ি খাও ভাই সবাই... বিড়ি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো...

— বিড়ি কী ফেলনা? বিড়ি ফুকিং is injurious to health এ কথা লেখা আছে কোথাও? না জেনে একটা কথা বলেন কেন? জানেন শীলাদি, হো-চি-মিন্ আই মীন্ চাচা হো নাকি বিড়ি খেতেন...

— আমার দরকার নেই এ সব হাবিজাবি কথা জানার...

— দরকার নেই বললেই হল? জানেন, শক্তিমান কবি, কবিদের শক্তিদাতা শক্তিদা, শক্তি চাটুজ্যে কী বলেছেন?

— শক্তি চাটুজ্যে? মাগো! শক্তির কথা বলো না আর! আমার বাঘের ভয় লাগে। একটা বাঘ-মার্কা কবিতার দুটো লাইন মনে পড়লে আমার থরহরি কম্পমান অবস্থা হয়। মনে মনে বাবা দক্ষীণরায়ের নাম জপ করি। মনে হয় এক্ষুণি একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার 'হালুম' করে আমার ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়বে।

মেঘলা দিনে দুপুর বেলা যেই পড়েছে মনে,
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুল বনে।

— বাঘ সম্বন্ধে শক্তি কী লিখেছেন ভালো করেই জানেন দেখছি ...

— বাঘের কবিতা বলে কথা!

— বাঘের কবিতা নয়, কবিতার বাঘ বলুন!

— সে তোমার একই কথা! মাগো! কাব্য-কবিতায়ও বাঘের উৎপাত! বাঘের কবিতা, বাঘের গান, বাঘেশ্রী রাগ কত কী যে শুনি তোমাদের মুখে....

— বাঘেশ্রী নয়, বাগেশ্রী! স্থায়ী-অন্তরাটা একটু গেয়ে শোনাব?

— রক্ষে কর! তোমাদের ঐ এ্যাজমা রুগীর শ্বাস-টানের মতো 'উশ্চাঙ্গ' সঙ্গীত শুনলেও আমার গা গুলোয়! সঙ্গীতে 'রাগ-রাগিনী' কবিতায় আবার 'বাঘ-বাঘিনী'! কবিতার বাঘ আর বাঘের কবিতা, আমার বাপু ওসব ভয় লাগে!

— ভয়ের কী আছে? 'আধুনিক কবিতায় বাঘের আনাগোনা' অথবা 'উত্তর-আধুনিক কবিতায় বাঘিনীর থাবা' 'শক্তির কবিতায় ব্যাঘ্র-শক্তি' এসমস্ত বিষয় নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে ডক্টরেট নেয়া যায়। শুধু আধুনিক কবিদেরই দোষ? তুলসীদাস থেকে তুষার রায়, বাঘ নিয়ে কাব্যি করনে নি? কবি তুষার রায়ের কবিতা পড়েননি বুঝি? 'হনিমুনে বাঘ ডাকে'? শুনুন না, তুষারের কী সুন্দর পংক্তি কয়টা—

> আমারো ইচ্ছে হয় ছুটে যাই,
> গুহার গভীরে গিয়ে বাঘিনীর শরীর মেখে শুই...

— ছিঃ ছিঃ শেষ পর্যন্ত বাঘিনীর সাথে হনিমুন! ... নির্জন গুহায় গিয়ে... বাঘিনী ডাকলেই হ্যাংলার মতো যেতে হবে। আর বাঘিনীর বাঘটাই বা কেমন কাপুরুষ বাঘ? কবিদের কী যে আক্কেল আর কাণ্ডজ্ঞান মাইরী...

— শুধু কী শক্তি আর তুষার? আপনার প্রিয় জীবনানন্দ কম কীসে? আর তুলসীদাস? বলেননি—

> দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী
> ঘর ঘর লহু চোষে...

মানুষের চেয়ে মানুষী যেমন ভয়ঙ্কর, বাঘের চেয়ে বাঘিনীও আরো ভয়ঙ্কর। বাঘ নিয়ে শক্তি কী লিখেছেন পড়া আছে দেখছি আপনার। কিন্তু বিড়ি নিয়ে কী বলেছেন শক্তি তা জানেন?

— বিড়ি খাওয়া নিয়ে? উনি বুঝি খুব বিড়ি খেতেন?

— শুধু কী বিড়ি? তাড়ি-ধেনো-মহুয়া-গাঁজা-চরস্-ভাঙ-সিদ্ধি-বাংলা-বিহারী। এছাড়া খিদিরপুর-খালাসীটোলা-ডায়মণ্ডহারবার-দীঘা-ঘাটশীলা এমন কী

আমাদের ত্রিপুরার জিরানীয়া-চম্পকনগর-উনকোটি-লালসিংমুড়া-কসবা-মাতাবাড়ি-নরসিংগড়-গোর্খাবস্তির বিখ্যাত দেশী মাল নির্বিচারে সবই খেতেন। তবে বিড়িটা খুব ভালোবাসতেন... বিড়ি কোম্পানীগুলো কেন যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে একটাও বিজ্ঞাপন তৈরী করল না! আসলে কবিদের কেউ দাম দেয় না তো। বিড়ি খেলেও না, সিগারেট বা মদ্য খেয়ে 'পদ্য' লিখলেও না। বিড়ি খেতেন বলেই শক্তিদা...

— খুব খান গিয়ে! শক্তির কবিতা আমি পড়িও না; 'অবনী বাড়ি আছো, অবনী বাড়িআছো' বলে যতই ডাকাডাকি করুন না কেন। আমাদের অফিসের কেশিয়ার অবনী মজুমদারই একমাত্র, যেহেতু তার নামটা আছে কবিতায়, আদেখলামো করে শক্তির কবিতা পড়ে শোনায় তার নূতন বৌকে। শুনেছি মদ্য পান করে অনেকেই তাঁর অনুকরণে শিব গড়তে বাঁদর গড়ে। এসব শক্তিহীন বালখিল্য নব্য কবিরাই শক্তির প্রতি ভক্তি জাহির করতে গিয়ে তাঁর কবিতা নিয়ে মাতামাতি করে। এ ছাড়া আর কেউ তাঁর কবিতা পড়ে আগরতলায়?

— কে না পড়ে? শক্তি সঞ্চয় করার জন্য দুর্বল কবিরা চিরকাল শক্তির আরাধনা করবেই। শক্ত-মদ্য (Hard-drink) সহযোগে শক্তির পদ্য পড়বেই।

— মরুক গে! মাগো! এতো প্রলাপ বকতে পার তুমি! কী যেন একটা জরুরী কথা তোমাকে বলতে এসেছিলাম ভুলেই গেছি ছাই! তা শক্তির বিড়ির কথা কী যেন বলছিলে তুমি?

— হ্যাঁ। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, বিড়িরা খুব অভিমানী হয়, সুন্দরী অথচ নরম মনের মেয়েদের মতো! ঘন ঘন চুম্বন না পেলে নিস্তেজ হয়ে যায়...

— ছিঃ! কী সব বাজে কথা জান তুমি, অনুপম?

— বাজে কথা?

— রীতিমতো অশ্লীল। 'চুম্বন' আবার কী? 'চুমো' বা Kiss বল।

— 'চুমো' বড়ো হালকা কথা, 'চুম্বন'ই সঠিক। ওসব কিসমিস (Kiss-Miss), মনাক্কা টিন্-এজারদেরকেই মানায়। ঘন ঘন চুম্বন মানে ফুক্ ফুক্ করে অনবরত টানতে হবে বিড়ি। সিগারেটের মতো জ্বালিয়ে হাতে রেখে দিলে, অমনোযাগী হলে বিড়ি প্রতিশোধ নেয়;নিভে যায়...তখন আপনার মতো দশা হয়।

—কী দশা হয়েছে আমার?

— এই যে যার তার কাছে দেশলাই চাইতে হচ্ছে!

— একটা সামান্য দেশলাই কাঠির জন্য এতো কথা বলছ তুমি?

— দেশলাই কাঠি সামান্য হল? দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে কতো প্রতিবাদী আন্দোলন করেছেন আপনি এককালে। তাবড় তাবড় ব্যাক্তিদের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন। আপনার নেতৃত্বে এক দঙ্গল মারকুটে ছাত্রী রাগে দুঃখে একবার ডাকসাইটে মন্ত্রী দুঃখময় দাসগুপ্তের লম্বা দাড়ি পোড়াতে গিয়েছিল না দেশলাই জ্বালিয়ে? আপনার নেতৃত্বের কথা ইতিহাস হয়ে আছে! আমরা জানি না?

— কী আর এমন বিখ্যাত নেত্রী ছিলাম! তুমি একটু বাড়িয়ে বলছ ভাই!

— প্রতি বছরইতো ছাত্র-সংসদের নির্বাচনে লড়তেন আপনি!

— হ্যাঁ! রাজনীতি আমার দ্বিতীয় সত্ত্বা! তাই লড়তাম প্রাণপণ।

— লড়তেন প্রতিবছরই এবং হারতেনও!

— লড়ে হারতাম। এক বারতো অল্পের জন্য হেরে গেলাম! সে তোমার এক কাহিনী... বীরেনের কারসাজিতে । আমাদের ছেলেরা বুঝলে...

— জানি! হাড়-কঞ্জুস আপনার পয়সায় সস্তার রুটি-তরকারি-জিলিপী খেয়ে ছেলেরা সারা কলেজ চত্ত্বরের সমস্ত দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে আপনার প্রচার করল— "প্রতিবাদী চরিত্র শীলা ভট্টাচার্যকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন"। পরদিন দেখা গেল, রাতের অন্ধকারে 'শীলা'র 'শ'দীর্ঘ-ইকারের সব কয়টা 'লুপ্' চুন দিয়ে মুছে দিয়েছে 'কে বা কাহারা'। কাণ্ড দেখে সবাই হেসে কুটি কুটি। শুধু অফিসেই নয়, কলেজেওতো বীরেনটা আপনার প্রতিপক্ষ ছিল! বীরেন আপনার দলের ছেলেদেরকে আবার পেট পুরে কষা মাংস-ঘুগনি-পরোটা-আলুরদম-দৈ-সন্দেশ-চমচম খাইয়ে কাৎ করে দিল। ওদেরই হাতের গুণে আপনার সাড়ে-সব্বোনাশ! রাতারাতি সব 'শীলা ভট্টাচার্য' হয়ে গেল একেবারে 'শালা ভট্টাচার্য'। শালায় শালায় কলেজের সমস্ত দেয়াল ছয়লাপ! দেয়ালে দেয়ালে শুধু 'শীলালিপি' থুড়ি, 'শালালিপি'। শালা ভট্টাচার্যকে আর কে ভোট দেয়? আপনি হেরে ভূত!

— বলেছে তোমাকে! এ সব বীরেন আর আমার যত হিংশুটে

শত্তুরদের বানানো গল্প। আর হারলেও বীরেনের সাথে কম্পিট্ করে সে বার বেশ ভালো ভোট পেয়েছিলাম আমি। সামান্য ভোটের পার্থক্য ছিল...

— কিছু ভোটতো পাবেনই। কলেজের ছেলেদের মধ্যে, বিয়ে না হলেও, অনেক ভাবী স্ত্রৈণ ছেলে ছিলতো। ভাবী গৃহিণীর ভাই মনে করেই হয়ত আপনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল কেউ কেউ। নিজের শালাকে কে না ফেভার করে...

— তোমার মাথা! গাধা কোথাকার! এসব তোমার বানানো গল্প।

— বানানো গল্প? বীরেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না...

— বাদ দাও! যে কথা বলছিলাম, তোমার মতো কঞ্জুসের কাছে সামান্য দেশলাই কাটিও যে এমন মহার্ঘ হতে পারে জানতাম না! দাঁত-খুঁচানো বা কান-চুলকোনোর জন্য একটা দেশলাইয়ের কাঠিও কাউকে হাতে তুলে দিতে তোমার প্রাণ বেরিয়ে যায়? মাগো! একটা দেশলাইয়ের কাঠির জন্য সাত কাণ্ড মহাভারত আর সতেরো পর্ব রামায়ণ!!
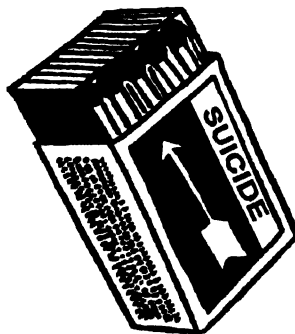
দেশলাই ও তার কাঠি, বিড়িখোর লোকেরাই শুধু অপচয় করে না।
দাঁত-খুঁচানো, কান-চুলকোনো, সামান্য কারণে গায়ে কেরোসিন ঢেলে
মাথাগরম দুঃসাহসী কাজেও এর ব্যাবহার বাড়ছে।

যার হাত আছে তার কাজ নেই
যার কাজ আছে তার ভাত নেই
যার ভাত আছে তার হাত নেই
— সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

অনুপম ও শীলা; শীলা ওরফে শীতলা। যেন শীতলা ও তাঁর বাহন। একটি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থায় তারা দিনগত পাপক্ষয় করে, রাজা-উজীর বধ করে। নিশ্চিত নিরাপত্তার ঘেরাটোপে দেশোদ্ধার করে। এ সব সংস্থায় নিত্য কুরুক্ষেত্র, নিত্য রাবণবধ। কাজ নয়, ছদ্ম-রাজনীতি ও খৈ ভাজা কর্মীদের হবি বা শখ। এক্ষণে আমরা পুনরায় অনুপম-শীলার দ্বৈত-সংলাপ শুনি—

— শীলাদি, মেচ্ চাইছেন কেন? মেচ্ দিয়ে উনুন ধরাবেন অফিসে?

— আরে চাইছি কী আর সাধে? দাঁতের ফাকে ব্রয়লার আটকে আছে...

— ছি! শীলাদি! আপনি এখনো, অনন্তত আমার চোখে যথেষ্ট সুন্দরী।

— থ্যাঙ্ক ইয়ু ফর দি কম্‌প্লিমেন্ট। সত্যি বলছ?

— আমি শুক্রবার দিন মিথ্যে কথা বলি না। সন্তোষী মা'র দিব্যি।

— তোমাকে একটা নিরেট গাধা বলেই জানতাম। তাহলে তোমারও দেখার চোখ আছে? সৌন্দর্যবোধ আছে? আমার ধারণা ছিল পে-বিল, অ্যাটেনডেন্স খাতা আর চার-দেয়াল, দেয়ালের কেলেণ্ডার বা দেয়াল ঘড়ি, চায়ের কাপ ছাড়া বোধ হয় তুমি কিছু চোখে দেখ্ না...

— চারদিকেই চোখ, মানে পুঞ্জাক্ষী আছে আমার। আপনার আগা-পাশ-তলা খুঁটিয়ে দেখা আমার। আপনার 'অন্ধকার বিদিশার নিশা' কালো চুলে রূপালী 'লীক্' অর্থাৎ উকুনের উত্তরপুরুষ-ডিম-শাবক এসব দেখতে হলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগে না, অমার মায়োপিয়া-দৃষ্টি, মাইনাস-টু পাওয়ারের চশমাই যথেষ্ঠ।

— বেশ অভদ্রতো তুমি! বল, আর কিছু বলবে?

— আরো আছে, আপনি যে জুতো ব্রাশ করেন না, পায়ের নোখ কাটেন না, ময়লা শূর্প-নোখ ল্যাকমী, রেভলন্ নেল্‌পালিশ দিয়ে লুকিয়ে রাখেন, পাকা

ফুটির মতো ফাঁটা পায়ে রাঙাজবা আলতা পড়েন, পায়ের গোড়ালী ছাড়িয়ে আপানার ভয়ঙ্কর রকম ময়লা ওভারকোট না কি পেটিকোট নোংরা ফ্লোরে লুটোপুটি খায় এসব গুহ্য বিষয় আমিই প্রথম লক্ষ্য করি; যথারীতি বিষয়টা উৎসাহী আর দশজনকে দেখাই। চোখ না থাকলে. আই মীন্ দেখার চোখ না থাকলে, ডান-বাম-উপর-নীচ সব দিক থেকে না দেখলে একটা মানুষকে পুরো দেখা হয়? এত্তসব দেখা যায়?

— এভাবে ডান দিক বাম দিক থেকে দেখবে কেন অভদ্রের মতো?

— ডান দিক থেকে দেখলে, আমি মাঝে মাঝে লুকিয়ে দেখিতো, আপনাকে লাস্যময়ী শতাব্দী রায় বলে ভ্রম হয় আমার। আবার বাম-দিক থেকে দেখলে শাবানা আজমী বলে ধন্ধ লাগে! একদিন হয়ত আম্মা জয়ললিতা বলেও ভুল করে বসতে পারি আপনাকে... আপনার যা ক্রমঃবর্দ্ধমান ধাত...

— ছিঃ অনুপম! তুমি যে এমন ছেলে জানতাম না।

— কিন্তু আপনি আমার সমূহ সর্বনাশ করলেন শেষতক!

— কীসের সর্বনাশ?

— সর্বনাশ নয়, একেবারে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি! এতো ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমার মনে একটা বিশেষ স্থান ছিল আপনার। আর আপনি কিনা আমার সমস্ত স্বপ্ন সমূলে নস্যাত করে মেচের কাঠি দিয়ে আমারই সামনে বসে... আপনার এনামেল ক্ষয়ে যাওয়া অথবা পোকায় খাওয়া দাঁত... না ভাবতেই গা শিউরে ওঠে আমার... চিন্তা করুন, আপনিতো অমিতাভ বচ্চনকে ভালোবাসেন...

— বাসতাম এককালে। এখন আর...

— এখন আর বাসেন না। কারণ অমিতাভ বুড়ো হয়ে গেছেন তো! এখন শাহ্রুখ খানকে ভালোবাসেন। আই মীন্ সেই রকম ভালোবাসা নয়, এক-তরফা ভালোবাসা মানে. তাঁকে পছন্দ করেন।

— এতে দোষের কী আছে? চাঁদ-তারার দিকে যে কেউ চাইতে পারে। হাত না বাড়ালেই হয়। তবে যখন যে ফর্মে থাকে তাকেইতো লোকে ভালোবাসে! তুমি চাও না মনীষা-মাধুরী-কাজোলের দিকে ড্যাব ড্যাব করে?

— চাইব না কেন? তা বলে কী কাজোলের সামনে বসে বসে আমি দাদ চুলকোব? দন্তকাষ্ঠ, আই মীন্ টুথপিক্ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অভুক্ত-অজীর্ণ

ব্রয়লারের দেহাবশেষ উদ্ধার করব? দাঁত খুঁচিয়ে...

— দাঁত খুঁচানো কী দোষের?

— দোষের নয়ত কী? চিন্তা করুনতো, শাহ্রুখ খান আপনার সামনের সীটে বসে যদি 'ঢেউ-উ-উ' করে এক একটা গুরুভোজন অথবা অম্বল-জনিত বিরাশি-সিক্কার চোঁয়া-ঢেকুর তুলে আপনার ভালো লাগবে? কিংবা যদি, ফ্যাৎ ফ্যাৎ করে নাক ঝাড়ে, পাকা সর্দ্দি সাফ করে আপনার ভালো লাগবে?

— বল, তোমার যা মনে আসে।

— মিথ্যে বলছি কী? ধরুন, আপনি অমিতাভ বচ্চনকেও এককালে ভালোবাসতেন, অমিতাভের কারণে অর্থাৎ অতিরিক্ত অমিতাভী ফিল্ম দেখার ফলে ব্রণ-ক্ষত মুখ নিয়েও নায়িকা হতে ইচ্ছুক বোম্বাইমুখী আপনাকে সামাল দিতে বাগে আনতে নাকি বাড়িতে অনেক অশান্তি হয়েছিল আপনার?

— ডাহা মিথ্যে কথা!

— মিথ্যে নয়, আজ শুক্রবার এটা মনে রাখবেন। আপনি না মানলেও সন্তোষীমা জাগ্রত দেবী, এটাও মনে রাখবেন। অমিতাভ আসঙ্গ-লিপ্সায় আপনার বিষে-অঙ্গ-জরজর-উন্মাদিনী-রাইয়ের দশা হয়েছিল, এ কথা আপনি নিজেই একদিন বলেছেন। বিশ্বস্তসূত্র থেকে এটা আমি যাচাই করেও দেখেছি। খাঁটি সত্য কথা। তো, এখন চিন্তা করুন, এই স্বপ্নপুরুষ অমিতাভ যদি আপনার সামনে বসে পিচিক্ পিচিক্ করে ভোজপুরী চাষার মতো থুথু ছিটোয়, খ্যাস্ খ্যাস্ করে বংশগত পোষা খুঁজলী অথবা প্রাচীন দাদ চুলকোয়, আপনার ভালো লাগবে?

— অনুপম, তুমি আমার ছোট ভাইয়েরও ছোট। তোমার চারিত্র সম্পর্কে অনেক কিছু কানে এসেছিল। বিশ্বাস করতাম না। এখন দেখছি অবিশ্বাস করারও তেমন কারণ নেই। যাক, আমার মেচ্ চাই না, দেশলাইও চাই না। তবে একটা কথা বলে রাখছি তুমি ট্রান্সফারের জন্য তৈরী হও। গাঁটরী বাঁধ। তৈদুবাড়ি, ঘোড়াকাঁপা বা ছৈল্যাংটা অথবা ঝুমরিতালাইয়া, কালাহাণ্ডি, ম্যাক্লাস্কিগঞ্জ অথবা চিক্‌মাগালোর যেখানেই তোমার পছন্দ তুমি যেতে পার স্বচ্ছন্দে।

— কেন, আপনিই আজকাল ট্রান্সফার পোস্টিং অর্ডারে শ্রীহস্তের সই করেন নাকি?

— আমি করি না। বড়সাহেব মিঃ ভেঙ্কিনাথন্ই করেন। তবুও তোমাকে বলে রাখছি, তুমি তৈরী হও... মিঃ ভেঙ্কিনাথন যার নাম...

— মিঃ ভেঙ্কিনাথনের ভেংচীকে আমি ডরাই না।

—ডরবে ঠিকই। যাও গিয়ে দেখ ক্যান্টিনে, বড়বাবু বসে বসে কাঁদছেন! এ কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছিলাম দৌড়ে। ভালো করে মুখও ধুতে পারিনি। ব্রয়লারের ফাইবার দাঁতের ফাঁকে কামড়ে বসে আছে। ছিঃ! অনুপম, তুমি যে এ রকম ছেলে ভাবতেও পারি নি। তোমাকে কত স্নেহ করতাম! সব মাটি করে দিয়েছ তুমি! একটা সামান্য মেচ-স্টিক, দেশলাইয়ের কাঠি...

— আবার ভুল করছেন শীলাদি। দেশলাইর একটা কাঠিসামান্য জিনিষ নয়! দেশলাই কাঠিতে অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। রাজনীতি আপনার দ্বিতীয় সত্ত্বা। এখন মমতাময়ী হলেও একদা প্রগতিবাদী মেয়ে আপনি। আপনার জানা থাকা উচিত, সুকান্ত তাঁর একটা কবিতায় বলেছেন—

> আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি;
> এতো নগন্য, হয়ত চোখেও পড়ি না,
> তবু জেনো—মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ!
> বুকে আমার জ্বলে উঠার দুরন্ত উচ্ছ্বাস!

— তোমার কাছে দেশলাইয়ের কাঠি চেয়েই ঘাট হয়েছে আমার।

— জানেন, একটা কবিতাই আছে জীবনানন্দের 'দেশলাই কাঠি' নামে!

> যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে, জ্বলিবেই— হালভাঙ্গা জাহাজের স্তূপে,
> তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে।

— খুব হয়েছে! দেখো গিয়ে বড়বাবু যে ভাবে কাঁদছেন! নেতারা সবাই সান্তনা দিচ্ছে... রূপালী পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তবুও তার কান্না থামছে না।

— বড়বাবু কাঁদছেন ক্যান্টিনে বসে? কেন বাড়িতে কেঁদে আসতে পারেননি? তা কাঁদবেন কেন, বাড়িতেতো আর রূপালী নেই! কী হয়েছে তাঁর?

— ন্যাকা! কী হয়েছে তুমি জান না?

— ঠিকই জানি না। ন্যাকামী পছন্দ করিনা আমি...

— তুমি বড়বাবুকে গাধা-ফাদা কতকিছু বলনি সকালে? সাক্ষী নেই আমাদের? মানুষকে অপমান করে কী আনন্দ পাও তোমরা? এখন টের পাবে How much rice in how much paddy বাংলা করে বলে দিই— টের পাবে কত ধানে কত চাল। হিতাহিত জ্ঞান নেই তোমার! জান, বাল্যশিক্ষায় কী আছে?

— 'বাল্যশিক্ষা' একটা ছাত্রবধ্য খটমটে বাজে বই! বাল্যকালে পড়েছিলাম! কী কী আছে তা কি আর মনে আছে?

— 'বাল্যশিক্ষা'য় আছে, মানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য... 'বিল্বফল খাইতে সুস্বাদু' আরো কত ভালো ভালো কথা...

— আরো আছে, মনে পড়ছে এখন! 'শীতকালে কুজ্ঝটিকা হয়'... 'ধনীরা অট্টালিকায় বাস করে' ইত্যাদি। ধনীরা অট্টালিকায় বাস করে এটা সবারই জানা! ধনীরা অট্টালিকায় বাস না করে কি কুঁড়ে ঘরে বাস করবে? আর 'দালান বাড়ি' থাকতে এতো অট্টালিকা অট্টালিকা করা কেন বাপু!

— আসল কথাটার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ তুমি! 'মানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য' এ কথাটা ভুলে গেলে! এই নীতি কথাগুলো কেন আছে বাল্যশিক্ষায়?

— সে আছে ছেলেদের যুক্তাক্ষর আর বানান শেখানোর জন্য। এছাড়া আর কী দাম আছে এসব ছেঁদো কথার!

— কী?! এসব ছেঁদো কথা? মনীষীরা কি তোমার মতো ঘাস খেয়ে বেঁচেছিলেন। ঘাস খেয়ে, ঘাসে মুখ দিয়ে এসব মূল্যবান কথা পাঠ্য বইতে লিখেছেন?

— ঘাসের কথা, ঘাস খাওয়ার কথায় হাসি পায় আমার! জীবনানন্দ পড়ুন আপনিও ঘাসপ্রিয় হবেন।

অনুভাগ-৪

সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস ... ...
সেই থেকে হাসায় এ পৃথিবীকে ঘাস
ছমাস গাধাকে আর মনীষীকে ছয়মাস।
— **জীবনানন্দ দাশ।**

অনুপম-শীলারা একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের করনিক। গাধা হলেও তারা কেউ ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। শষ্পভোজী নয় এমন প্রাণীকেও তারা ঘাস খাইয়ে ছাড়তে পারে প্রয়োজনে। এই সব প্রতিষ্ঠানে অনেক কৃতবিদ্য খলিফা করিৎকর্মা ব্যাক্তি আছেন যাঁরা মাঠে ময়দানে রাজনীতি করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। নেহাত ছাপোষা কেরানি বলে, পেটের দায়ে চাকরীর মোহে এই খাটালে পড়ে আছেন। অনুপমের মতো কিছু অবাধ্য গাধার পোষ মানতে যা কিছু দিন সময় লাগে। একদিন অনুপমও হয়ত ঝাঁকের পাখী ঝাঁকে ভিড়ে যাবে। উপস্থিত শীলা অনুপমের বালখিল্য আচরণে ক্ষুন্ন হয়। 'বাল্যশিক্ষা'র মতো একটি শাশ্বত গ্রন্থ যা কি না আগাগোড়া মনীষীদের বাণীতে পরিপূর্ণ তার প্রতি অনুপমের অবজ্ঞায় তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

— অনুপম, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো জ্ঞানী মনীষীর বাক্যকে তুমি ছেঁদো কথা বলছ? তোমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করা যায় না... মনীষীরা বলেছেন, মানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য, অপমানিত হওয়া আর মাথায় বাজ পড়া সমান।

— ছেঁদো কথা না তো কী? মানী লোকেরা অপমানের কোন তোয়াক্কাই করে না। কত মানী মানী মন্ত্রীদের সাংবাদিকরা অপমান করতে চায়, পাবলিক বজ্রাঘাত করতে চায়! মানী লোকেরা গায়েই মাখেন না। অপমানজনিত বজ্রাঘাতে কোন মানী লোককে কেউ মরতে দেখেছে? তা হলে আর মন্ত্রী পাওয়া যেত না দেশে! তারপর, 'কুয়াশা'র মতো একটা সোজা-সরল শব্দ থাকতে 'কুজ্ঝটিকা' নিয়ে কুস্তি করার কোন মানে আছে? এভাবে সরলমতি শিশুদের মনে পড়াশুনার প্রতি একটা অহেতুক ভীতির ভাব সঞ্চার করে, বছর বছর স্কুল থেকে 'ড্রপ-আউটের' সংখ্যা বাড়ানোর এটা হীন চক্রান্ত। শিক্ষার গতি রোধ করতে এটা একটা

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের যড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই না। চিন্তা করুনতো, 'কুজ্ঝটীকা'র মতো একটা বিদ্ঘুটে স্পেলিং শেখার কি মানে আছে? এভাবে শিশুদের বিভ্রান্ত করার অর্থ আছে আপনিই বলুন? আপনি এতো টাকা মাইনে পান, মুখস্ত-বিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী,পারবেন 'কুজ্ঝটীকা' বানান করতে?

— আমার বয়ে গেছে 'কুজ-বটিকা' বানান করতে!

— বানান করবেন কি উচ্চারণই হয়নি 'কুজ্ঝটীকা'! বাল্যশিক্ষাটা আপনারও দেখছি ঠিক ঠিক হয়নি! অজ্ঞানতার কুজ্ঝটীকা কাটেনি দেখছি আপনার। বানান-টানানগুলো অন্তত আপনার শেখা দরকার ছিল!...

— বললামতো দরকার নেই আমার!

— দরকার নেই বললেই হবে এখন? নিজেইতো বাল্যশিক্ষার প্রসঙ্গটা আনলেন। মানীর অপমান, হ্যান-ত্যান। আবার কিনা 'বিল্ব ফল খাইতে সুস্বাদু' এমন একটা ন্যাকা ন্যাকা কথার মানে কী? একটা ছোটছেলেও জানে বিল্বফল খাইতে সুস্বাদু। আর সুস্বাদুই একথার কোন গ্যারন্টি আছে? কাবহিডে পাকা বিল্বফল 'খাইয়া' দেখেছি! রাম কহো! কী বিস্বাদ! কী বিস্বাদ!! মাগো! সবার কাছেই বিল্বফল 'খাইতে' সুস্বাদু লাগবে? আমার রেণুপিসি, বিল্বফল নিয়ে তার কাছে গেলে বিল্বফল আপনারই মাথায় ভাঙবে। এমন বিল্ব-বিদ্বেষী ও। আর বাজারের কার্বাইডে পাকা এমন অখাদ্য বিল্বফল গাধায়ও খাবে না, এমনকি আমাদের বড়োবাবুও খাবেন কিনা সন্দেহ। এ বয়সে বাল্যশিক্ষা পড়ে আর বানান শিখে কী হবে বলুন?

— তোমাকেও এবার সবাই বানান শেখাবে। দেখো গে, রূপালী পাশে বসে পিঠে হাত বুলিয়েও সান্তনা দিতে পারছে না। বয়স্ক মানুষ বড়োবাবু...

— তা রূপালীর কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই কোন? কই, কোনদিনতো বড়বাবুর সাথে হেসে দুটো কথা বলতেও দেখিনি। বড়োবাবুর প্রসস্ত ইন্দ্রলুপ্ত, অল্প-স্বল্প পাকা চুল দিয়ে চাতুরী করে সাহারা মরুভূমির মতো বিশাল ইন্দ্রলুপ্ত লুকোনোর অপপ্রয়াস দেখে রূপালী হেসে হেসে ঢলে পড়েনি বাপের বয়সী নেতা বীরেন পালের গায়ে? আর বীরেনটা এমন তিলে-খচ্চর, বুঝলেন শীলাদি... বাকিটা আপনার সামনে আমি বলতে পারছি না। শত হলেও আপনাকে আমি জনৈকা পর্দা-কাঁপানো প্রাক্তন লাস্যময়ীর সমকক্ষ মনে করি। যাক, এসব বললেই আপনারা

বলবেন, অনুপম খারাপ ছেলে... এখন বড়োবাবুর দুঃখে একেবারে...

— মানুষের দুঃখে সমবেদনা জানাবে না?

— সমবেদনা? সেদিন যে ক্যান্টিন ম্যানেজার বুড়ো নিবারণ সাহা, বুড়ো বয়সে বউ মরে অনাথ হল; বউয়ের শোকে চিৎকার করে কাঁদল তখন রূপালী কোথায় ছিল? টিট্‌কিরি দেয়নি তখন 'বুড়ো মিনসে' বলে, নিবারণ সাহাকে? মনে আছে, আমিও একদিন কেঁদেছিলাম অফিসে। কই রূপালীতো আমার পাশের টেবিলেই বসত তখন! আমার দুঃখে কেঁদেছিল ও? আমার যে চোখে জল এল ফিরেওতো দেখল না।

— তুমি কেঁদেছিলে? কেউ মেরেছিল তোমাকে?

— তা, আমার কি দুঃখ-কষ্টের কারণ থাকতে পারে না? আমার মনে না হোক শরীরে ব্যাথা লাগতে পারে না? অপমানবোধ না থাকলেও শারিরীক কষ্টবোধ থাকতে পারে না আমার?

— কেউ কিছু বলেছিল তোমাকে?

— কী আর বলবে! কারো কথা শুনি আমি?

— না, গাধা-টাধা কেউ কিছু তোমাকেও বলেনি তো?

— বললে?

— কে বলেছে তার নাম বল!বড়বাবু তোমাকে গাধাবলেছিল কি? তা হলে তুমি ঠিকই করেছ। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো।তোমার জন্য আমি লড়াই করব। বীরেন পালের পার্টিবাজী বার করব আমি! তোমার অপমান আমাদের সবার অপমান। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি! আমি অর্গানাইজিং সেক্রেটারী... এবার ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী হতেই হবে আমাকে। আমি তীব্রতর প্রতিবাদ জানাচ্ছি...

— কিসের প্রতিবাদ?

— কিসের মানে? তোমাকে কেউ গাধা বলবে তুমি ছেড়ে দেবে?

— তবে কি গাধার মতো ডাক ছেড়ে কাঁদব?

— প্রতিবাদ করবে! প্রতিবাদের নামই জীবন!

— কিসের প্রতিবাদ করব?

— কেন,বড়বাবু তোমাকে আগে গাধা বলেননি?

— বড়বাবু আমাকে গাধা বলবেন কেন? আর বললেই আমার কী এমন এসে যায়? আপনিও বলুন আমাকে গাধা! চাই কি নিরেট-গাধা, আস্ত-গাধা, বোকা-গাধা, বর্বর-গাধা, যে কোন প্রজাতির গাধা বলুন না!

— মাগো! কোন মান-অপমানবোধ নেই তোমার?

— কীসের অপমান। বড়বাবুই আমাকে একদিন বলেছিলেন, কেরানীর কাজ, বাবারে! কেরানির কাজ মানেই সাতগাধার কাজ! মান-অপমানবোধ থাকলে এ কাজ করতে পারবে না বাপু! ছেলেমানুষ, কথাগুলো মনে রেখো বাপু! ধোবার গাধার মতো কেরানী-জীবন! এসব বড়োবাবুরই কথা...

— তবুও গাধা বললে তোমার মনে লাগে না?

— মনে লাগে না তবে...

— তবে আবার কী!?

— কানে লাগে!

— খারাপতো লাগে? তাই না?

— বেশ লাগে! শুধু কানেই লাগে; মনে লাগে না আমার!

— একই কথা হল! অপমান অপমানই! মানীর অপমান বজ্রাঘাত...

— কীসের অপমান? কিসের বজ্রাঘাত? আমার কানে খারাপ লাগে না তো! ছোটবেলার কথা মনে পড়ে! পণ্ডিতমশাই আমাকে গাধা, রাসভ, রাসভলোচন বলে ডাকতেন। কী মিষ্টি লাগত ডাকটা আমার কাছে!

— মাগো! অনুপম, তোমার গাধার-খুরে সহস্র দণ্ডবৎ! তুমি নমস্য!

— শীলাদি! কী যে বলেন! আমার চোখে আপনি এখনো প্রাক্তন সেই পর্দা-কাঁপানো মার-কাটারী লাস্যময়ী... আমাকে অপরাধী করবেন না, মাইরী!

— গ্যাস দিতে হবে না! তা, তুমি কেঁদেছিলে কেন সে কথা বল।

— কাঁদব না? ভাঙা ষ্টিলের টেবিল-চেয়ারে বসি। ঐ যে, গত পুজোর আগেইতো... সিটে আটকে গেলাম না আমি একদিন?

— সিটে আটকে গেছলে? পক্ষাঘাত হয়েছিল তোমার? স্ট্রোক্ করেছিল?

— স্ট্রোক্ করার মতো অবস্থাই তো! হাত আটকে গেল না একদিন ড্রয়ার লক্ করতে গিয়ে! হাত কেটে ফালাফালা, রক্তারক্তি কাণ্ড!

— শুনিনিতো! আমি কোথায় ছিলাম?

— অফিসেই ছিলেন! হয়ত ঘুমুচ্ছিলেন। কোন নিষিদ্ধ স্বপ্ন দেখছিলেন...

— যাঃ, তারপর?

— তারপর, আমার চিৎকার শুনে অনেকে ভাবল, এসব আমার আদিখ্যেতা, ভড়ং। কাজে ফাঁকি দেয়ার মতলব।

— কেউ উদ্ধার করল না তোমাকে?

— কে করবে? সবাইতো প্রথমে তেড়ে গালাগালি শুরু করল।

— গালাগালি?!

— হ্যাঁ! বুদ্ধিমান ষ্টাফেরা সবাই বলল, আরে এই গাধা আবার কী করে আটকে গেল! কই, আমরাওতো বাবরের ঠাকুর্দা হর্ষবর্ধনের আমলের ভাঙা টেবিল-চেয়ারেই বসি! বুদ্ধি থাকলে আটকে যায় কেউ...

— ইয়ুনিয়নের নেতাদের ডাকলে না কেন চিৎকার করে?

— ডাকলাম তো! কেউ এল না...

— গলার জোরে শ্লোগান দিলে না কেন?

— আরে শ্লোগান দিয়েইতো সব্বোনাশ হল আমার!

— কেন?

— প্রথমেই ভুল করলাম! বললাম কিনা 'শহীদের রক্ত, হবে নাকো ব্যার্থ'! সবাই ধরে নিল আমি মরেই গেছি আমাকে আর বাঁচাবে কী!

— এটা কী করলে তুমি? তোমার কী আক্কেল বলতে কিছু নেই? ধান ভানতে শিবের গীত! এ অবস্থায় এই শ্লোগানটা মানায়?

— কী করব! এদিকে ত্রিশঙ্কু অবস্থা আমার! যুৎসই কোন শ্লোগানই আমার মনে পড়ছিল না তখন! তা না হলে, জ্বালাময়ী ভাষণই দিতে পারতাম আমি টলষ্টয়-গান্ধী-মার্কস-লেনিন এমনকি লাদেন-বুশ-ব্লেয়ার-মোশারফ-বাজপেয়ী-বসু কোট্ করে করে...

—রক্তপাত হলেই বুঝি শহীদ হয়? তাহলে পাঁঠাদের কী দোষ?

— কী করব বলুন শীলাদি! নিজের রক্ত দেখে আমি রক্তশূন্য ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলাম না?

— ছিঃ এটা বাড়াবাড়ি! কোন বিরোধী নেতাকে ডাকলেনা কেন?

— ডাকলাম তো! ইয়ুনিয়নের নেতা বীরেন বলল, আগে আড়াই বছরের বকেয়া চাঁদা, উয়িদ্ ইন্টারেস্ট মিটিয়ে দিতে! তারপর হাত ছাড়ানোর কথা চিন্তা করবে। এতোদিনে বাগে পেয়েছে তো...

— তা, তুমি মিটিয়ে দিলে পারতে যখন তখন?

— কী করে দেব? আমার হাত আটকে গেছে বললাম না!

— তুমি কারো কাছ থেকে ধার করে আপাতত দিয়ে দিতে পারতে!

— কেউ ধার দিল আমাকে? সেন্ট-পার্সেন্ট সুদ দিতেও রাজী ছিলাম আমি... রেশন-কার্ড, সার্ভিস-বুক বন্ধক রাখতেও রাজী ছিলাম।

— কেউ দিল না? আমি বোধ হয় ছুটিতে ছিলাম! না হয় দিতাম... সেন্ট পার্সেন্ট সুদ কি ফেলনা? কারো কাছে পেলে না?

— পেতাম! কিন্তু ঐ পিয়ন, থুড়ি, স্কর-পিয়ন বেটা সনাতন!

— সনাতন কি করল আবার?

— সনাতন বলল, 'কেউ টাকা ধার দেবেন না ওকে! আজ আট বছর কেটে যাচ্ছে, ওর কাছে আমি আঠারো টাকা পাওনা। সুদে-আসলে তিন হাজার টাকা হয়ে গেছে! আজ দেব কাল দেব করে শুধু।' তখন আর কেউ টাকা দেয় এই অবস্থায়। তারপর এই পুরনো জংধরা সস্তার ষ্টিলের টেবিলের ঘষায় কাটা! গ্যাংগ্রিন-ইনফেকশন হয়ে আমি যে বাঁচব তার গ্যারাণ্টি কী? এ কথাও কোন কোন চিন্তশীল, স্থিতধী বুদ্ধিজীবী ব্যাক্তিরা বললেন। এদিকে টেবিলের ইঁদুর-কলে বন্দী আমি ব্যাথায় কঁকিয়ে কাঁদছি তো কাঁদছিই...

— তুমি বিরোধী ইয়ুনিয়নের কাউকে ডাকলে পারতে!

— ডাকলাম না? কতো করে ডাকলাম মধু সাহাকে। নেতা মধু সাহা পরামর্শ দিল হাত কেটে ফেলতে। সরকারী সম্পত্তি ভাঙচুর করা যাবে না।

— সব্বোনাশ! তারপর? ইশ...

— তারপর এক বিক্ষুব্ধ নেতা, ডব্লু. বি. ডি'সুজা ঈশ্বরের নামে সে যাত্রা বাড়ি থেকে কুড়ুল এনে লোহার টেবিল কেটে আমাকে উদ্ধার করল।

— এখন ডি'সুজাতো তোমার আদ্যশ্রাদ্ধ করে আবার। তুমি নাকি একটা গাধা, হামবড়া, মাথামোটা গবেট! আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক এখন তোমাদের।

— ও আমাকে বাঁচিয়েছে যখন আদ্য-শ্রাদ্ধও করতেই পারে!

— ডি'সুজা! খুব একটা সোজা ছেলে নয়! বেশ হ্যাংলা স্বভাবের!

— এ্যাংলোতো! এ্যাংলো ছেলেরা একটু হ্যাংলো-টাইপেরই হয়!

— একটু না, বেশ ভালো রকম হ্যাংলাই... একটু গায়-পড়া স্বভাব!

— আপনার গায়ে ঢলে পড়েছিল কী?

— একটু হলেই পড়ত! আমি ঝট্ করে সরে না গেলে...

— ঠিক টাইমে সরে যেতে, শীলাদি, আপনার জুরী নেই! মাইরী!

— যাঃ! ডব্লু. বি. ডি'সুজার পুরো নামটা কী জান?

— উইলিয়াম বেঞ্জামিন না কী যেন...

— গাধা! তোমার মাথা! মধুদা বলে, ওয়াগন্ ব্রেকার ডি'সুজা নাকি!

— সব্বোনাশ! এমন বে-আইনী নাম হয় নাকি কারো?

— কেন হবে না? এটাও সাহেবদেরই নামতো!

— শীলাদি, কি বলছেন আপনি!! ওয়াগন্ ব্রেকারতো ডাকাত! রেলের ওয়াগন্ ভেঙ্গে ডাকাতি করে যারা! এক টাইপের মাফিয়া!

— তাইতো! ডি'সুজা নাকি হাওড়া-টেরর্ সেই ডব্লু. বি. ডি'সুজা! যার কথা এক কালে কাগজে খুব লেখত! আমাদের কর্পোরেশনে পুনর্বাসন পেয়েছে ডাকাতি ছেড়ে। এই ডি'সুজা তোমাকে বাঁচিয়েছে! এ জন্যই তোমাকে সবাই ঘৃণা করে! সঙ্গ-দোষে যা হয় আর কি!

— এ জন্য ঘৃণা করে?

— করবে না? মধুদাতো বলে, এরচো অনুপমের মরে যাওয়া শ্রেয় ছিল! ডি'সুজার হাতে জীবন ভিক্ষা! এমন জীবনের কী মূল্য...

— কারণ?

— কারণ আবার কী? মধুদাতো বলে, ডি'সুজার মতো একটা প্রাক্তন ওয়াগন্ ব্রেকার যার জীবন বাঁচায় সে ওয়াগন্ ব্রেকারের চেয়েও ঘৃণ্য! সেই কুডুল সহ ডি'সুজা আর তোমাকে পুলিশে দিতে পারে মধুদা ইচ্ছে করলে!

— কুড়োলটার কী অপরাধ আবার?

— অপরাধ কুড়োলের নয়, কুডুলের মালিকের!

—যেমন?

—আরে গাধা! কোন কিছুর খবর রাখ তুমি? সেই কুড়ুলটাই ডি'সুজার ওয়াগন্ ভাঙার কুড়ুল না কি! কোন ভদ্রলোক বাড়িতে কুড়ুল রাখে? ডি'সুজা এখন শুধু অপেক্ষায় আছে কবে আগরতলায় রেল আসবে! তারপর তোমাকেতো সাগরেদ বানিয়েই ফেলেছে, তোমরা দুই স্যাঙাৎ মিলে তখন ওয়াগন্ ভাঙবে।

— আমিও ওয়াগন ভাঙব আগরতলায় রেল এলে?

— তুমি নাকি কথা দিয়েছ ডি'সুজাকে?

— কবে?

—ঐতো যেদিন তোমাকে উদ্ধার করল ডি'সুজা। মুচলেকা দিয়েছ নাকি!

— কি যেন প্রতিজ্ঞা একটা করিয়ে নিয়েছিল ও আমাকে দিয়ে। তারপরই আমাকে টেবিলের মরণ-কামড় থেকে উদ্ধার করে অবশ্য!

— তুমি প্রতিজ্ঞা কর নি যে আগরতলা ষ্টেশনে মালগাড়ি এলে সেই বারো-সেরী কুড়ুল দিয়ে ওয়াগন ভাঙবে তুমি ডি'সুজার সাথে মিলে?

— আমার তখন হুঁস ছিল না হাতের ব্যথায়! কী বলতে কী যেন বলেছি হয়ত। প্রাণের দায়ে, তখন মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল অবস্থা...

— তা বলে ওয়াগন ভাঙার শর্তে প্রাণ বাঁচাবে তুমি?

— ডি'সুজা যখন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে তাই করব তবে।

— ধন্য তুমি! আবার বলতে হয়, মানীর অপমান... তোমার আবার অপমান বোধ! যে তোমার আদ্যশ্রাদ্ধ করল সেই তোমার প্রাণ বাঁচাল। মধুদা ঠিকই বলে এমন প্রাণের কোন দাম নেই!

—আদ্যশ্রাদ্ধ করলেও ডি'সুজাই আমার বিপদে মধুসুদন! ত্রাহি মধুসুদন, ত্রাহি মধুসুদন বলে যখন হাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম আমি, কই নেতা মধুসুদন সাহাতো ফিরেও তাকাল না!

—তা হলে ডব্লু. বি. ডি'সুজাই তোমাকে উদ্ধার করল প্রাণঘাতি ভয়ঙ্কর টেবিলের কব্জা থেকে? এটাই সত্য?

— হ্যাঁ। একেবারে বিনা স্বার্থে করেনি! সে তার নিজের লুপ্ত জনপ্রিয়তা পুণরুদ্ধারের জন্য, নাকি আলাদা দল গঠনের জন্যই কে জানে, না কি ওয়াগন

ভাঙার ব্যাপারেই আমার সমর্থন চাইল। আমি চোখ বুজে ডি'সুজাকে নিঃশর্ত সমর্থন করলাম। তারপর ও বাড়ি থেকে কুড়োল এনে কুড়োল দিয়ে ড্রয়ার কেটে আটকে পড়া আমাকে উদ্ধার করল। তারপর ডি'সুজা-মধুসুদন-বীরেনের কতো রাজনীতি...গজকচ্ছপ যুদ্ধ! সেতো আপনারা জানেনই। আমারো মনে আছে সব!
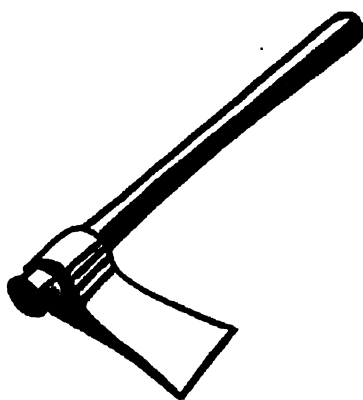
Wagon-breaking Axe, ওয়াগন ভাঙ্গা বারো সেরী কুড়ুল-আগরতলায় রেল এলে এর চাহিদা বাড়বে।

তোমার ঘৃণার দিকে
আমি ফিরিয়ে রেখেছি
আমার ভালোবাসার মুখ
— সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

মিছিমিছি মিছিল, মিছিমিছিল। গাধার মিছিলে একটি সুন্দর মুখ। কিন্তু এই হাস্নুহানায় কেরোসিনের গন্ধ। সঙ্গদোষে, পরিবেশের কল্যাণে এই ঊষর ভূমির ফুলে সুগন্ধ নেই। রূপালীর রূপ আছে, স্নিগ্ধতা নেই। মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, তবে এ রূপে কারো মুগ্ধতা নেই। অনুপম মনে মনে তাকে ভালোবাসত। হয়ত আজও বাসে। রূপসী রূপালী zানতি পারেনা। শীলা অনুপমের কান্নার উৎস সন্ধানে উৎসুক—

— তুমি বড়ো প্রসঙ্গ পাশ কাটিয়ে যেতে পার! কেমন দিব্যি তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ! কথা হচ্ছিল 'কান্না' নিয়ে। তো, কাঁটা হাত নিয়ে অফিসে বসে হাও-মাও করে খুব কেঁদেছিলে বুঝি?

— হাও-মাও করে নয়। তবে হ্যাঁ! ভাঙা টেবিলে বসে সারাদিন কত চেষ্টা করে বিভিন্ন ঘরানায়, নানান কায়দায় কাঁদলাম আমি।

— বিভিন্ন ঘরানায়? কান্নারও আবার ঘরানা!!

— হ্যাঁ। আগ্রা-আম্বালা-পাতিয়ালা, হিন্দুস্তানী-কর্নাটকী-পাঞ্জাবী বিভিন্ন ঘরানায় কালোয়াতি ঢংগেইনিয়ে-বিনিয়ে, বিলম্বিত-দ্রুত লয়ে কতো করে কাঁদলাম। রূপালীর দিকে আড়ে আড়ে চাইলাম কতো...

— এটা আবার কেমন অভদ্রতা? আড়ে আড়ে চাইলে কেন?

— চাইলাম এ জন্যে, রূপালী যদি একটু শান্তনা দেয় আমাকে! ব্যাথাটাতো শুধু হাতে না, আঁতেও... কই, রূপালীতো আমাকে পিঠে হাত বুলিয়ে শান্তনা দিল না একবারও! কেন রূপালীর হাত এতই দামী? আমার কাটাহাত বা কালো-কুঁজো পিঠের কোন দাম নেই? রূপালী যদি আজ এ অবস্থায় পড়ে,হাপুস নয়নে কাঁদে, আমি পারব তার পিঠে হাত না বুলিয়ে? সে চাইলেই কী, না চাইলেই

কী ! আমারওতো একটা কর্তব্যবোধ আর সহমর্মিতা আছে। তাই নয় কি?

— রূপালীর পিঠে তোমাকে হাত বুলাতে হবে না। ওর হাত বুলানোর লোক আছে! কোন কেরানির উচ্ছিষ্ট হাত রূপালীর পিঠ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না, মনে রেখো! সেই হাত-ওয়ালা এক পুলিশ অফিসার! তোমার কালো হাত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে! নুলো হয়ে বাঁচতে হবে তোমাকে বেশী বাড়াবাড়ি করলে!

— তা দিক! ভেঙ্গে দুমড়ে দিক। আমার যে পলকা হাত। পুলিশ অফিসারের দরকার হবে না! যে কোন হোমগার্ডই যথেষ্ট। কিন্তু রূপালীরতো এই একপেশে ব্যাবহারটা ভালো নয়...

— রূপালী দেবে তোমাকে শান্তনা! আমি থাকলে হয়তো... শত হলেও তোমার চোখেতো আমি ফেলনা নই... তবুও রূপালী হাত আর আমার হাত! পঁচিশ বছরের ছোট বড়ো হাত...।

— তা, তুমি যাই বল, তোমাকে কাঁদতেই হবে অনুপম।

— কোন দুঃখে কাঁদব আমি?

—বড়বাবুর অপমান আমরা সহ্য করব না। বড়বাবুর অপমান আমাদেরই অপমান— ইয়ুনিয়নের নেতারা একথাই বলছেন। সবাই মিলে এক্ষুনি এম. ডি., মিঃ ভেঙ্কিনাথনের চেম্বারে যাবে... তুমি তৈরী হও ফাঁসির জন্য!

এ যাবৎ আমরা দুটি চরিত্রই পেলাম। শ্রীমতি শী(ত)লা দাস ব্র্যাকেটে ভট্টাচার্য ও শ্রীমান অনুপম পাল। আমরা বারবার শ্রীমতি শী(ত)লা দাস ব্র্যাকেটে ভট্টাচার্য... ইত্যাদি না বলে ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে নিই গোড়াতেই। শ্রীমতি দাস একদা ভট্টাচায, দীর্ঘ কয়েক দাশক অনূঢ়া ছিলেন। চাকরি পাওয়ার পর, বর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যা-বংশগৌরব-কৌমার্য-কর্মকৌলিন্য-অর্থবিত্ত কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু কিছু আধিদৈবিক ব্যাপার-স্যাপার আর নিজের খুঁত-খুঁতে স্বভাবই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

নাগ যদি নাগা হয়, সেন হয় সেনা,
বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা।
— সুকান্ত ভট্টাচার্য।

শীলা ও অনুপম অর্থাৎ অনুপম ও শীলা, অর্থাৎ ওরা চার জন। কেন, খারাপ লাগছে? সুনীল যদি লিখতে পারেন, 'আমি ও নিখিলেশ, নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চার জন।' তা বুঝি দোষের হয় না? আমরা কবি নই, সুললিত বাক্য-বিন্যাস, পংক্তি-নির্মাণ আমাদের সাধ্য নয়। 'আমরা কাজে রই নিযুক্ত, কেউ কেরানি, কেউ অভুক্ত, লাঙল চালাই, কলম ঠেলি। যখন তখন শুনে ফেলি— রাম নাম সৎ হ্যায়....' (অমিয় চক্রবর্তী)। তাই কাব্য করা আমাদের সাজে না। আমাদের পৃথিবী নেহাত গদ্যময়। কবিতাকে ছুটি না দিয়ে বরং তাকে আমরা আমাদের কাজে লাগাই। কবিতাতো জীবনেরই কথা বলে। বলে না কি, 'বড়ো শক্ত কাজ এই বেঁচে থাকা' ? (বুদ্ধদেব বসু)। কবিতার ফাঁকে ফাঁকেই আমরা নেহাত গদ্যময় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিতো!

প্রথম যে ছেলেটির সঙ্গে তার লটঘট হয়— সুবল বল। ভালো ছেলে, বেতন পদমর্যাদা কোন ফ্যক্টর নয়। কিন্তু পরিণয়ের পরিণামে মিসেস বল, (একটু মোটার ধাত যখন, মিসেস্ বল থেকে গড়িয়ে মিসস ফুটবল নাম পড়তে কতক্ষণ?) নিজেকে সুবল বলের স্ত্রী ভাবতেই মিস্ শীলার হৃতকম্প। সুশীল শীল, উত্তম সুশীল ছেলে, উচ্চপদস্থ তবে উচ্চ বংশ নয়। অনেক সন্দেহবাদী লোক সুশীলকে ভদ্রলোক বলেই হয়তো গণ্য করবে না। শীলভদ্রের কুটুম্ব হলেও না। পরিণয়ের পরিণামে সেই মিসেস্ শীল! মাগো! কেমন যেন শোনায় না? মিসেস্ শীলা শীল; 'শীলা-শীল' সার্-নেম আগে আনলে 'শীল-শীলা'! শীলার এই সিল্‌সিলা ভালো লাগে? 'দিবাকর' চলে। খারাপ না! কিন্তু দিবাকর কর? ইশ! কেমন যেন কাঁকড়ের মতো কড়-কড় করে না? না, না! এসব এলাউ করা যায় না। Love-লোকসানের ব্যাপারে মিস্ শীলা খুব সেয়ানা ছিলেনতো!

শীলার যা ভাগ্য, শেষে যদি আবার 'দাঁ' 'খাঁ' 'পান' 'গণ' 'গুণ' 'মাঝি' 'ভড়' 'ধর' গাইতি-মাইতি-নট্ট-ভট্ট এসে লাইনে দাঁড়ায় ? এরচেয়ে 'দাস'ই ভালো। অগত্যা এক প্রতিষ্ঠিত দাস, ব্যবসায়ী দাস (দাস ব্যাবসায়ী নয়) দাসবংশের দাসত্বই স্বীকার করেন শ্রীমতি শী(ত)লা ওরফে শীলা দাস (ভট্টাচার্য)। এতে বৈষয়িক লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি তাঁর, একমাত্র ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্রে অবনমন ছাড়া।।

অবশ্য, রুগ্ন হলেও, একটি রাষ্ট্রায়াত্ব সংস্থার কর্মী হিসেবে, অনেক অবাঙালীর সংস্পর্শেও তিনি এসেছেন। পরিণয় সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে অনেক অবাঙালী পাত্র-অপাত্রও পরখ করে দেখেছেন। যেমন, মিঃ ঘুঙুরওয়ালা! মিঃ পাল্কীওয়ালা! মাগো! শেষমেষ মিসেস্ ঘুঙুরওয়ালী, পাল্কীবেহারার বউ পাল্কীওয়ালী! একবার এক 'ভাটনাগর'এর গলায় মালা দিতে দিতেও অল্পের জন্য বেঁচে যান। বাঁচিয়েছিল এই অনুপমই! অনুপমের যুক্তি ঐ মিঃ ভাটনাগর নাকি আসলে ভাটপাড়ার পুরুত। আর ভাটনাগরের ভাট ছেড়ে দিলে কি থাকে? 'নাগর' থাকে তো! সবাই বলবে, শীলা তার অফিসেরই এক নাগরের গলায় মালা দিয়েছে। এটা মানা যায়? যাক, শেষ পর্যন্ত দাসে এসে থিতু হলেন শীলাদেবী। এখন স্মৃতিচিহ্ন 'ভট্টাচার্য'টা জীবন বীমার জ্বলন্ত প্রদীপের মতো ব্র্যাকেটে রক্ষা করছেন।

শীলাদির সাথে অনুপমের সম্পর্ক খুব একটা খারাপ ছিলনা। শীলার মাঝখানে এই 'ত' পুশ্ করে অনুপম এককালে কত রস করেছে। ব্রণক্ষত মুখের জন্য এখনো মাঝে মাঝে শীতলা দেবী বলে শীলাকে খেপায় অনুপম। শীলাও অনুপমকে ছেড়ে কথা বলেনি। বরং ঝেড়ে কাপড় পড়িয়েছে অনেক বার। অনুপম নামটা যদিও খারাপ নয়, কিন্তু পদবী 'পাল'টা নিয়ে শীলা অনেক ঝামেলা পাকিয়েছিল। আজও প্রতিপক্ষ এই অস্ত্রটা প্রয়োগ করে মওকা মাফিক। অনুপম পালের 'পাল' পদবীর মাঝখানে প্যারেন্থেটিক 'গ' অক্ষরটির অনুপ্রবেশ শীলারই কল্যাণে। ফরস্বরূপ, অনুপম পা(গ)ল বেশ মুখরোচক ও শ্রুতিনন্দন হয়ে আজও মুখে মুখে কানে কানে অফিসময় আলোচনা হয়। অনুপমকে জব্দ করতে তার বিরোধী প্রতিপক্ষ এই মোক্ষম অস্ত্রটা হামেশাই ব্যাবহার করে আজকাল।

অনুপমের খামখেয়ালী স্বভাব ও উদ্ভটকীর্তি-কলাপের জন্য এমনিতেই তাঁর জনপ্রিয়তা নেই। চাঁছাছোলা বচন ও জটপাকানো বাক্যালাপের জন্য তাঁর সুনাম শূন্যের কোঠায়। তদুপরি এই 'গ'এর অনুপ্রবেশ বড়ো পীড়া দায়ক। তাকে উপহাসের পাত্র হিসেবে খাঁড়া করতে এই 'ক'-বর্গের তৃতীয় বর্ণটির অবদান কম নয়। ইদানিং এ ব্যাপারে আবার সনাতন নামক 'স্কর-পিয়ন' এবং রূপসী রূপালীই অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

শ্রীমতি শীলা ও অনুপমের অম্ল-কষায় সংলাপ থেকে আমাদের কাছে এটাই পরিস্কার হল যে অনুপম একটি তুচ্ছ কারণে এই রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটির একজন বর্ষীয়াণ প্রবীণ বড়বাবুকে অনুপম 'গাধা-ফাদা' বলে অপমান করেছে। স্বাভাবিক, বড়বাবুর অপমানে আমরাও অপমানিত, নিরপরাধ পাঠকও অপমানিত। সরকারী অফিসে কতো গাধা ঘোড়ার ঘাস কাটে। তবুও 'গাধাকে গাধা বলিতে নাই।' অনুপম কেন এই গর্হিত কর্ম করল? এর অন্তর্নিহিত গুহ্যতম কারণটা কী? অনুপম একটি ধারালো ছেলে, মেধা-বিদ্যা-ধীশক্তি সব নিয়ে শুধু পেটের তাড়নায় যে এই সংস্থাটিতে দিনগত পাপক্ষয় করে, মিঃ ভেঙ্কিনাথনও তাকে অপছন্দ করেন না। তবুও এর কারণ কী?

সরকারী অফিসে শুধু গাধারাই সারাদিন ঘোড়ার ঘাস কাটে।

অনুভাগ-৫

'পৃথিবীতে নেই কোন বিশুদ্ধ চাকরী'
— জীবনানন্দ দাশ।

মহাজন উবাচ— খালি পেটে ধর্ম হয় না। ধর্ম যেমন হয় না, সাথে সাথে অর্থ-কাম-মোক্ষা কোনটাই লাভ হয় না। জীবনানন্দ দাশ, রূপসী বাংলার কবি, শুনতে ভালোই লাগে। জীবনানন্দের কোন না কোন সুচারু পংক্তি অজ্ঞাতসারেও ভালোলাগে না, এমন শিক্ষিত বঙ্গসন্তান বিরল। বৃত্তিতে তাঁর তৃপ্তি ছিল কি? এই জীবনানন্দ দাশকে কষ্ট পেতে হয়েছে একটি মনের মতো চাকরীর জন্য। তাঁর চাহিদা ছিল সীমিত, আকাঙ্খাও আকাশছোঁয়া ছিল না। চেয়েছিলেন, তাঁর মন-মানসিকতা ও কোমল-মনোবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 'বিশুদ্ধ চাকরী'। সেই অতৃপ্তি নিয়েই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। সরকারী খাতায় নাম লিখিয়ে আমরা ভুলে যাই কর্মহীনতার কী জ্বালা, মনের মতো কাজ না পাওয়ার কী যে কষ্ট!

অনুপমের ব্যাক্তিগত ধারণা, ইংরেজী না জানা লোককে শিক্ষিত বলে না। শিক্ষার মানদণ্ডই হল ইংরেজী জ্ঞান। নেহাত গজমুর্খও সরকারী আপিসে দাপটে চাকরী করতে পারে, ইংরেজী এক বর্ণ না জেনেও। সরকারী আপিস এমন একটি মৃগয়াক্ষেত্র যেখানে দার্শনিক এবং গরুচোর পাশাপাশি শোভা পায়। অনুপম, যেহেতু বয়স অল্প, অভিজ্ঞতাও সীমিত, সে এই ভয়াবহ অবস্থা মেনে নিতে নারাজ।

বিদ্যাস্থানে ভয়েব চ, আমাদের আলোচ্য রুদ্যমান বড়বাবুর ইংরেজী জ্ঞান সেই অর্থে ভয়াবহ। 'I go up, We go down' জাতীয়। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের গোড়ায় সেই বাবু 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'এর আগেকার যুগের ইংরেজী-শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত বড়োবাবু! কোম্পানীর আমলের মুৎসুদ্দি-বেনিয়ানের মতো ইংরেজী জ্ঞান বড়োবাবুর। শব্দ-ভাণ্ডার আর ব্যাকরণ-জ্ঞানও তেমনি। সেই যে ছড়াটা আছে ইংরেজী শব্দার্থ শেখার, তেমননি জ্ঞান তাঁরও—

পাম্‌কিন্‌ লাউ-কুমড়ো, কুকম্বর শশা,
ব্রিণ্জেল বার্তাকু, প্লাউম্যান চাষা।

আরো আছে! অনুপমের স্বরচিত ফিরিস্তি! বড়োবাবুর ব্যাবহৃত শব্দসম্ভার নিয়ে অনুপম এই অনুপম অতুলনীয় ছড়াটি সবাইকে শোনায়। বড়োবাবুর জ্ঞান নাকি এই শব্দ-সমষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ! 'The Village School Master'এর মতো, অথবা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্পের সেই নন্দীপুরের ইংরেজী টিচারের মতো সামান্য কয়েক গণ্ডা শব্দই তাঁর শব্দকল্পদ্রুম। সেই কোন্‌ মান্ধাতার আমলে নন্দীপুর না গোঁসাইগঞ্জের কোন্‌ প্রভাত কুমারীয় 'ইস্কুল'এ দু'পাতা 'ইঞ্জিরী' পড়েছিলেন বড়বাবু! কিছু স্তাবক আর স্কর-পিয়ন সোনাতনের মতো কিছু ধূর্ত, এসব নিয়েই বড়োবাবুর সাম্রাজ্য। বিদ্যায় আইনষ্টাইন, জ্ঞানে ম্যাক্সমূলার বড়োবাবুর উপরে কথা চলে না। অনুপম ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেছে এই শব্দগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আন্দাজে ব্যাবহার করে বড়োবাবু বাজি মাৎ করে দেন! যেমন—

পুট-আপ রুজু করা; একাউন্টস লেখা;
রেকর্ডেড নথীবদ্ধ; পেরুজাল দেখা।
লুক-ইনটু লক্ষ্য করা, গো-থ্রু পড়া;
ইমিডিয়েট্‌ জরুরী, সিরিয়াস কড়া।
ষ্টেটমেন্ট বিবরণ, রিসেন্টমেন্ট খেদ;
শো'কজ্‌ কারণ দর্শাও, ডায়াজ্‌নন্‌ ছেদ।

এমন গোছের ইংরেজী জ্ঞান বড়বাবুর। এই জ্ঞান নিয়েও বিগত তিন দশক ধরে দাপটে রাজপাট চালিয়ে জীবন সায়াহ্নে এসে এক অর্বাচীনের কাছে অপদস্থ হলেন বড়বাবু। অনুপমের অনুপম উক্তি—

— বড়বাবু আপনি কি করে এই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী পেলেন? গাধার মতো বিদ্যবুদ্ধি নিয়ে আপনি বড়বাবুগিরি করছেন এতদিন!

— অনুপম! তোমার এতো সাহস! এ সব কাকে কি বলছ তুমি? আমি গাধা! হায়, হায়! আমার পিয়নের সামনে তুমি আমাকে গাধা বললে!!

— পিয়নের সামনেই বলি আর বড় সাহেবের সামনেই বলি— এতে

গাধার গাধাত্ব হানি হয় না। আপনি কি লিখেছেন এগুলো ফাইলে? দেখলে গাধাও হাসবে! পার্টস্ অব্ স্পীচআর ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান নেই আপনার...

অনুপম ও বড়বাবুর মধ্যে এটুকুই কথা কাটাকাটি হয়। তারপরই ক্ষুব্ধ অভিমানী বড়বাবু সনাতনের সাথে সেক্‌শন্ ছেড়ে চলে যান। বড়বাবুকে অনেকেই অনেক কথা বলে। বড়বাবু গায়ে মাখেন না। অনুপম জানতো, সুকুমারীয় 'হেড আপিসের বড়বাবু লোকটি বড়ো শান্ত'। বড়োবাবু লোকটি আসলেও শান্ত প্রকৃতির। অনুপম বুঝতে পারে, কাঁকড়াবিছে সোনাতনই বড়োবাবুকে তাতিয়েছে। স্করপিয়ন সোনাতনই বড়োবাবুর সুপ্ত সেন্টিমেন্টে সুরসুড়ি দিয়ে, হয়ত তাঁর চোখে গ্লিসারিন দিয়ে তাঁকে কাঁদিয়েছে। অন্যথায় মানুষটিকে সরল সাদাসিধে বলেই তাকে মনে হতো অনুপমের।

ঘটনার সাক্ষী ছিল একমাত্র সনাতন। বড়বাবুর পেয়ারের পিয়ন, অনুপম বলে 'স্করপিয়ন'। বড়ো বিপজ্জনক মাল। স্করপিয়ন, সনাতন পিয়ন বড়ো জালিম চিজ। তেজারতি কারবার এবং চতুর্থ-শ্রেণীকর্মীর চাকরি, দুটো সব্যসাচীর মতো সমান তালে দুহাতে সামলাচ্ছে সনাতন। অফিসে সনাতনের মক্কেল সংগ্রহ করে তেজারতি কারবার চালানোর ঘোরতর বিরোধী ছিল অনুপম। তাই বরাবরই সনাতনের বিষ নজরে আছে সে। এখন এই সনাতনই তার বিরুদ্ধে সনাতন সাক্ষী। এই সনাতনটি, সনাতন শীল। তার নাকি আঠারো তৃণ বুদ্ধি। ব্যাক্তিগত কারণে সনাতন অনুপমের উপর প্রসন্ন নয়। চথুর্ত-শ্রেণীর কর্মী হলেও সনাতন অর্থ-বিত্ত-রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রথম-শ্রেণীর আফসারকে টেক্কা দিতে পারে। বড়বাবুর চেয়ে এখন এই বড়বাবুর সনাতন সাক্ষীকেই অনুপমের ভয়।

বাবু নামক এক শ্রেণীর জীব বৃটিশ রাজ তথা আই.সি.এসদের তৈরী। বাবু, ছোটবাবু, বড়োবাবু, ভিন্ন শ্রেণীর বাবুরা এক কালে সরকারী দপ্তরে ছড়ি ঘোরাতেন। কালের অবোঘ বিধানে সরকারী আপিসের বাবুশ্রেণী হয়ত একদিন লুপ্তপ্রায় প্রজাতির জীবের মতো ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে যাবেন। দলবাজিতে ধড়িবাজ

বাবুসমাজ নৈষ্কর্ম-সাধনার সাথে সাথে প্রতিনিয়ত সমস্যা ও কলহ সৃষ্টিতেও সমান পারঙ্গম। জীইয়ে রাখা, পরিচর্যা করা, তারপর মওকা মাফিস এই জ্যান্ত সমস্যার ফায়দা আদায় করা, নিজের কোলে ঝোল টেনে নেয়া অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পক্বশস্য আহরণ করা এসব এলেমদার নেতাদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

এক্ষণে, আমরা যদি এই আধা-সরকারী, রুগ্ন, সমস্যাদীর্ণ, কর্মচারী বহুল প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার মিঃ ভেঙ্কিনাথনের কক্ষে দৃষ্টিপাত করি, আমরা দেখব মূল আসামী অভিযুক্ত অনুপম, অভিযোগকারী বড়োবাবু, মূল সাক্ষী খলিফা ছেলে সনাতন ছাড়াও কতিপয় নেতৃস্থানীয় যাদের মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক তাঁরাই বিষয়টিকে গুরুতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে মরীয়া। এ স্থলে, মিঃ ভেঙ্কিনাথন তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতায় দেখেছেন আলোচনা, সভা, বিতর্ক, যুক্তি, প্রতিযুক্তি, সাক্ষ-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের কোন সমস্যার তিনি হাল করতে পারেননি। তাই মূল আসামী, অভিযোগকারী ও

এক সনাতন সাক্ষী ছাড়া সবাইকে চলে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। নেহাত অনিচ্ছায় নেতারা গা তোলেন। দু'চারটি কথা বলে তিনি বুঝতে পারেন, অনুপমের প্রতি সনাতন কোন কারণে খুবই বিরূপ এবং এক্ষেত্রে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প। সক্ষী সনাতনকেও তিনি আপতত বিদেয় করেন। এতক্ষণে আমরা ফাঁকা চেম্বারে শুধু মিঃ ভেঙ্কিনাথন, অনুপম ও বড়োবাবুকেই পেলাম। আমরা শুনতে পারি তাঁদের কথোপকথন—

মিঃ ভেঙ্কিনাথন— অনুপমা! আপনি বড়াবাবুকে গাধা বলেছ্যেন্ এ কথা স্বীকার করেন? You can't say like that. This is against the office decorum.

অনুপম— স্যার, বড়োবাবুকে অনেকেই অনেক কিছু বলে! তবে সনাতন সক্ষী রেখে বলে না। আমি সক্ষী, আই মীন্, উইট্‌নেস্ রেখে 'গাধা' বলেছি। আমার ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে। আমি অ্যাপোলজি চাইছি স্যার...। 'গাধা-গরু-ছাগল যাই হই আমরা একই পরিবারের সদস্য, একে অপরের ভাই, এটা আমাদের মনে রাখা উচিৎ।

নদী-নালার পানি যেমন যে কোন উপায়ে সাগরে ধাবিত হয়, তেমনি সমস্যা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বড়ো-সাহেবের গোচরে যায়। যে কোন সমস্যা, সে যত ক্ষুদ্রই হোক পর্বত বহ্নিমান ধূমাৎ। এই ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার একটু ভিন্ন উপায়ে উপস্থিত সমস্যাটির হাল খুঁজেন—

মিঃ ভেঙ্কিনাথন— বড়াবাবু, মনে করুন, অনুপমা আপনার পুত্রের সমান! আপনি 'গাধা' হলে অনুপমা অল্সো গাধা হবে! But Annupama has the courage to confess his offence! অনুপম আপনার কাছে অ্যাপোলজি চাইছে! প্লিজ... অনুপম আর কোনদিন কোন বড়াবাবুকে 'গাধা' বলবেন না । Remember it ... মনে রাখবেন ...

অনুপম— বড়োবাবুকে গাধা বলব না! তবে গাধাকে বড়োবাবু বললে কি আপনার আপত্তি আছে স্যার?

মিঃ ভেঙ্কিনাথন— যত্তো খুশী গাধাকে 'বড়োবাবু' বলুন গে! গাধারা আপত্তি করতে বা এম. ডি'র কাছে বিচার চাইতে আসবে না। Yes, you can say the spade a space. I think Barababu also should have no objection?

অনুপম— Thank you Sir, for your quick justice. কিন্তু, আমাদের বড়োবাবু আপত্তি করবেন কি?

বড়োবাবু— স্যার, অনুপম যখন ক্ষমা চাইছে ওকে ক্ষমা করে দিলাম। আমার কোন অভিযোগ নেই আর। ও গাধাকে 'বড়োবাবু' বললে আমার কী আপত্তি থাকতে পারে? আমাকে না বললেই হল!

মিঃ ভেঙ্কিনাথন— বড়াবাবু! আপনি খুশীতো? Is it right?

বড়োবাবু— হ্যাঁয়েস্ স্যার, মানে হ্যাঁ... ইয়েস্ স্যার!

অনুপম— যে কোন গাধাকে 'বড়োবাবু' বলতে পারি বড়োবাবু?

বড়োবাবু— একশো বার বলবে!

অনুপম— একশো বার নয়, শুধু একবারই বলি। তা হলে, চলুন, এবার সেকশনে যাই বড়োবাবু। কাজ করি গিয়ে! Thank you once again, Sir, for your....

শ্রীদামের ধনেপাতা ও বাদামবিলাস

সতর্কীকরণ

স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিরা, যাঁহারা নওলকিশোরদের
বঞ্চিত করিয়া হর্মোনগ্রাহী সঙ্কর জাতিয়া আধুনিকা দুগ্ধবতী গাভীদের দুগ্ধ
উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া প্রত্যহ সেবা করেন, ধনেপাতা-বাদাম
ও দেশী গরুর দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারেন না,
তাঁহারা '**শ্রীদামের ধনেপাতা ও বাদাম-বিলাস**'
পড়িবেন না।

শ্রীদামের ধনেপাতা ও বাদাম-বিলাস

প্রথম ধাপ

অহল্যা পাষাণ ছিল,
দামনামে উদ্ধারিল।

'শ্রীরাম' খুব স্পর্শকাতর নাম। শ্রীরাম ত্রেতাযুগে রাবণের সাথে বিবাদ করেছিলেন নাকি রাবণ তাঁর সাথে সংঘর্ষে গিয়ে ছিলেন, এসব 'কুমড়ো-কাটা' ভাসুরের ভাবনার বিষয়। তেমনি কলিযুগে শ্রীরাম মরহুম বাবরের সাথে বিবাদ করছেন না কি মরহুম বাবর শ্রীরামের সাথে কাজিয়া করছেন তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। নিত্য মহভারতের কুরুক্ষেত্রে রামায়ণের রাবণবধ হচ্ছে। রাম-রামায়ণ-রহিম দোহন করে অনেকেই ক'রে খাচ্ছেন। এসব ব্যাপারে আমাদের তেমন উৎসাহ নেই। জয় শ্রীরাম বা আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি দেয়ার জন্য মন্দির-মসজিদ আর মাঠ-ময়দান আছে। নিষ্কলুষ 'দূরসঞ্চারিকা'র পৃষ্ঠা এজন্য খুব উপযুক্ত স্থানও নয়।

শ্রীরাম ত্রেতাযুগে নাকি অহল্যা উদ্ধার করেছিলেন। রামায়ণে নারী নির্যাতন ও নারীমুক্তিই প্রধান উপজীব্য। নারী-নির্যাতন ও নারী-মুক্তি ক্লাসিক বিষয়, জটিলও। আবারো এসব বিতর্কিত প্রসঙ্গের অবতারণা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শ্রীরাম প্রস্তরীভূতা অহল্যা নাম্নী কোন নারীকে উদ্ধার করেছিলেন না কি বনবাসের সময় বনের পাথুরে জমি অর্থাৎ অহল্যাভূমি উদ্ধার করে চাষের যোগ্য করে সীতার মনোরঞ্জনের জন্য ধনে ফলিয়ে ছিলেন, তাও রীতিমতো মোটা মাইনের 'আজাইর‍্যা' (নিষ্কর্মা) অধ্যাপকদের গবেষণার বিষয়।

আমাদের ধারণা অহল্যা নারী ছিলেন না; শ্রীরামও তাকে উদ্ধার করেননি। যিনি নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেন না, নিজের স্ত্রীকে মাস্তানের হাত থেকে উদ্ধার করতে অন্যের সাহায্য ও করুণা ভিক্ষা করেন, বানর-হনুমানের কৃপা প্রত্যাশা করেন তিনি আর কী অহল্যা উদ্ধার করবেন! শ্রীরাম যা উদ্ধার করেছিলেন তা ছিল সর্বংসহা স্বর্ণ-প্রসবিনী ভূমি। তাও নিজের প্রয়োজনেই তিনি করেছিলেন।

চাষ-বাস করে অন্ন ফলানোর তাগিদেই হয়তো করেছিলেন। মহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব আরোপ করে আমরা মানুষকে দেবতা আর দেবতাকে মানুষ বানিয়ে ছাড়ি। শ্রীরাম নয়, আমাদের গল্পের মূল চরিত্র শ্রীদাম। শ্রীরামের মতো শ্রী দামও অহল্যা উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীদাম লিচুবাগানের অহল্যাভূমি আবাদ করেছিলেন। পাথরে সোনা নয়, লাল-মাটিতে ধনে ফলানোর প্রয়াস নিয়েছিলেন। এ নিয়েই আমাদের গল্প।

গল্পের নায়কের খোঁজে বিদেশ-বিভূঁই যেতে আমাদের আপত্তি আছে। ত্রিপুরার লাল মাটিতে বুঝি নায়কের জন্ম হয় না? আমাদের গল্পের নায়ক বলিউড-হলিউড-টলিউডের কোন ফিল্মি-তারকা নন। দামবাবু ওরফে শ্রী দাম— শ্রীদাম বা ছিদাম নয়। তস্য জায়া, দাম-বিবি ওরফে শ্রীমতি দাম— অবশ্যই শ্রী মতি দাম নয়। তাঁদের একরত্তি ছেলে দাম-শিশু— মোটেই দামোদর নয়। তাঁরা তিনজন। দাম বাবু মোটামুটি মোটাই; দাম-বিবিও তাই। আর দাম-শিশু, সেতো আধাখানও নয়! তবুও, শিব্রামদার ভাষায় বলতে গেলে দামবাবু দামবিবিদের মোটামুটি আড়াই জনের সুখী সংসার। দামবাবু একটি বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ক্রমঃপরিবর্তনশীল 'বহুরূপী' আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি মোটা বেতনেই কর্ম করেন।

বহুরূপী প্রতিষ্ঠান নয়তো কী? বহুরূপী গিরগিটি যেমন প্রতিনিয়ত রূপ বদলায়, দামবাবুর কর্মস্থল, অন্নদাতা প্রতিষ্ঠানটিও থেকে থেকে স্বরূপ বদলায়। আগে ছিল প্রাগৈতিহাসিক বাবরের গরুর ডাক বিভাগ; শের শাহের ঘোড়ার ডাক বিভাগ। ইংরেজ প্রভুদের হাতে পড়ে হল সাহেবের ডাক ও তার বিভাগ। স্বাধীন ভারতেও তাই; ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ। হঠাৎ পালে লাগল পশ্চিমী হাওয়া। ডাক-তারের হাতুড়ে ডাক্তারি আর চলে না। সাবেকী ব্যবস্থা আর ভালো লাগল না; ভাইকে ছেড়ে পৃথগন্ন হয়ে, নূতন বোতলে পুরনো মদ। হল ডি. ও. টি.। অচিরেই তাও ভালো লাগল না; খোল-নলচে পাল্টে, ভাবের ঘোরে কীর্ত্তনীয়ার মতো 'সখী আমায় ধরো গো ধরো' তৃতীয় ভাব, এখন সোনার হরিণ, বি. এস. এন. লিমিটেড। আবার না জানি কী মর্জি হয়, খোদায় মালুম। যাক, এসব মাঠ ময়দানের কথা। রাম কহো! এসব কুকথা থাক। আমরা বরং দামবাবুর অহল্যা-উদ্ধারের গল্প শুনি।

দামবাবু খুবই পরিশ্রমী-কর্মকুশল-অমায়িক। দাম-বিবিও তথৈবচ। তিনিও সদালাপী-অতিথি পরায়ণা-সুগৃহিণী। গেরস্থালী সামাল দেন; ছেলের যত্ন-আত্তি করেন। মোটা ভাত, মোটা জেবর্, মোটা কাপড়ের ভোক্তা না হলেও দামবিবির তেমন মোটা কোন চাহিদা নেই। সাদামাটা হলেও, শ্রীরাম অথবা শ্রীদাম অথবা অদৃশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় মোটের উপর সুখের সংসারই তাঁদের।

দামবিবির রান্নার হাত ঈর্ষণীয় রকম ভালো। পাঁচতারা হোটেলের শেফও লজ্জায় গলায় দড়ি দেবে একবার এ রান্না খেলে। দাম-বাবুর খাওয়ার ক্ষমতাও অসাধারণ রকম ভালো। দাম-শিশুর হাসি আরো ভালো। এখন শীতকাল। শীত মানেই রকমারী রন্ধন ও রসনা-তৃপ্তিকর ভোজন। দামবাবুর বাজারের হাত দরাজ, প্রচুর দাম দিয়ে ভালো ভালো শাকসব্জী, পেস্তা-বাদাম আর মাছ কেনেন। দাম-বিবি রান্নার বই না পড়েই মনোযোগ দিয়ে রাঁধেন বাড়েন। দামবাবুও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে গুপ্ত-কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতো পরিতৃপ্তি সহকারে খান।

এখন আমরা মূল বিষয় ধনেপাতা ও বাদামে যাই। ধনে পাতা ঈশ্বরের একটি শীতকালীন আশীর্বাদ। বাদাম ঈশ্বরের বারোমেসে করুণা। আমাদের জ্ঞান-গরিমা কম। দামবাবুর মুখেই আমরা শুনিছি ঈশ্বরের গৃহিণী হেঁসেলে মশলা বেটে এক প্রকার আগাছায় হাত মুছতেন। মর্তলোকে তাই ধনে গাছ নামে কলিযুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তেল স্নেহজাতীয় পদার্থ। তৈলবীজ বাদাম স্নেহের জমাট রূপ। ঈশ্বর তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহ প্রাকৃতিক স্নেহের আধার অর্থাৎ তৈলবীজ বাদামের মধ্যে রেখে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কলিযুগে তাই বাদাম বা চীনে বাদাম রূপে চীন দেশে আত্মপ্রকাশ করে। স্নেহ-জাতীয় বাদামের প্রয়োগ তাই রন্ধনশিল্পে নূতন মাত্রা আনে। ভালো রান্নার জন্য এসব উপকরণ একান্তই দরকার।

ধনেপাতা ও বাদাম ছাড়া দাম-পরিবারের একবেলাও চলে না। বলা যায় দামবাবু ও দামবিবি বাদাম ও ধনেপাতার গুণমুগ্ধ। এক বার প্রসঙ্গ তুলতে পারলে দামবাবুর ধনেপাতার গুণকীর্তন, সাতকাহণ ভাষণ শেষ হতে চায় না। বাদাম-ধনেপাতা নিয়ে রীতিমতো পড়াশুনো ও গাবেষণা আছে দামবাবুর।

ধনে সম্পর্কে দামবাবুর অসাধারণ সাধারণ জ্ঞান। ধন্যাক বা ধনে প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কী বলেন, অক্সফোর্ড-চেম্বারস্ আর রাজশেখর বসু-সুবল মিত্র, ডঃ শহীদুল্লাহ্, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলকাব্য ও পূর্ববঙ্গ-মৈমনসিংহ বিশেষজ্ঞ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, চৈতন্য-চরিতামৃত, শব্দকল্পদ্রুম, চলন্তিকা, বঙ্গীয় শব্দকোষ— কে কী বলেন, কোথায় কী আছে সবই দামবাবুর জানা। দামবাবুর কল্যাণে আমাদেরও জানা।

মশলার দেশ আমাদের ভারত। আমাদের দেশে প্রচুর ধনে উৎপাদন হয়। জাতীয় মশলা বোর্ড শুধু ধনে রপ্তানী করেই ভবিষ্যতে প্রচুর আন্তর্জাতিক ধন ইয়োরো-ডলার অর্জন করবে আমরা আশা করি। বলা যায়, ধনবান না হলেও একশো কোটি মানুষ আমরা যথেষ্টই 'ধনেবান'। দামবাবুর দুঃখ হয়— মানুষ আসল ধনের স্বাদই জানে না। ধনের নামে আম-জনতা বাজার থেকে রঙচঙে প্যাকেটে বিশুদ্ধ করাতের গুঁড়ো চড়া দামে কিনে গৃহীণীর হাতে তুলে দেয়। পিটুলী-গোলা জল খেয়ে দুধের স্বাদ পেতে চায়।

আসল ধনের স্বাদ পেতে হলে ধনে চাষ করে উদুখল-মুষল (অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতির মূল হাতিয়ার, মহেঞ্জোদরোর যুগের প্রগৈতিহাসিক traditional apparatus, ঠাকুরদার আমলের গাব-কাঠের দেশী 'গাইল' 'ছিয়া') ব্যাবহার করে ধনে গুঁড়ো করতে হবে, শিল-নোড়ায় (অর্থাৎ আমাদের সনাতন 'পাডা-পোতা'য়) ধনে পিষতে হবে। আর তার জন্য অবশ্যই গৃহিণীর গায়ে গোবর গামার মতো সাত পালোয়ানের বল থাকতে হবে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও ধনে-ধনেপাতার উল্লেখ আছে। হয়তো রন্ধন-পটিয়সী দ্রৌপদীরও ধনেপাতা ছাড়া চলত না। বনবাস-অজ্ঞাতবাসের সময় ধনেপাতার জন্য শ্রীমতি কৃষ্ণাকে না জানি কী কষ্ট পেতে হয়েছে! মহাভারতকার এব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। দামবাবু পাঁচসেরী কাশীদাসী মহাভারত আঁতিপাতি করে খুঁজেও ধনেপাতার সন্ধান পাননি। এমন কোন পয়ার খুঁজে পাননি—

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
ধন্যাক মশলার কথা অমৃত সমান।।

তবে পুরনো সাহিত্য ঘেটে দামবাবু এটা জানতে পেরেছেন সংস্কৃত 'ধন্যাক'এর অপভ্রংশ বাংলায় ধনিয়া বা ধনে। হিন্দি-বলয়ের মানুষও ধনিয়াই বলেন। আমরা আগরতলার কাঠ-বাঙালেরা, যতই লেখা-পড়া করি, য-ফলা ও আকারান্ত শব্দের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড দুর্বলতা। আমরা গলা ছেড়ে বলি 'ধইন্যা, ধইন্যাপাতা'। খাস কলকাত্তই ঘটি বাড়ির মেয়ে বৌ হয়ে আগরতলায় এসে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে ধনের অকৃপণ প্রয়োগ দেখে প্রথম দিনই স্বামীকে বলেন, ধন্যবাদ! ধন্য তোমরা! ধন্য তোমাদের 'ধন্য' আর 'ধন্য-পাতা'।

ধন্যাক বা ধনের ইংরেজী Conander গ্রীক শব্দ Korianner থেকে এসেছে নাকি ! রন্ধনশিল্প ও মশলা-বিষয়ক অনেক পুস্তক দামবাবুর পড়া আছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম পাক-প্রণালী তথা রান্নার বই **The Roman Cookery**. দামবাবু যতটুকু জানেন, তাতে জিরে, গোলমরিচের গুঁড়ো ও অন্যান্য মশলার কথা আছে। শত চেষ্টা করেও **The Roman Cookery**'র কোন কপি সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আমরা জানতে পারলাম না মাত্র ১০০ খ্রীষ্টব্দে রচিত উক্ত রান্নার বইতে ধনে বা ধনেপাতার উল্লেখ আছে কি না! প্রতিটি ধনেই যে দ্বিবীজ অর্থাৎ একটি ধনের ভেতর যে দুটো বীজ, ফলস্বরূপ একটি ধনে থেকে দুটো গাছের সৃষ্টি এ তথ্যও দামবাবু মারফৎ আমরা জানতে পারি। এতো কিছু জানার পর, এ অধমের মতো নির্ধন মানুষেরও ধনেপাতা ছাড়া চলে না।

এহেন ধনে-বিশারদ দামবাবু যদি ধনে চাষের জন্য মরীয়া হয়ে লিচুবাগানের কাঙ্করময় অহল্যাভূমি আবাদ করেন তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। দামবাবু বলতেই পারেন— বি.এস.এন.এল কৃষি কাজ জানে না। এমন সরকারী জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা। চীনেবাদাম হয়ে আবার আমরা ধনে-প্রসঙ্গে আলোচনা করব। আসুন, এবার আমরা চীনের মাল, দামবাবুর প্রিয় চীনেবাদামকে চিনে নিই।

দ্বিতীয় ধাপ

চীনেবাদাম সর্দিকাশি
ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি। — সুকুমার রায়

অজ্ঞ আমরা আরো জানতে পারি ধনে বপনের আগে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে Germination করিয়ে নিতে হয়অর্থাৎ ধনের অঙ্কুর বের করে নিতে হয়। অন্যথায় আড়াই মাস সময় নেবে ধনে থেকে গাছ হতে। এতো শক্ত ধনের বীজের খোলা। রাঁধুনী বাটতে গেলে টের পায়— কত ধনেয় কত বীজ। রাঁধুনীর কব্জীতে জোর না থাকলে ধনে শিল-নোড়াতে ধনে বাটা কঠিন। বাজারের ভেজাল গুঁড়ো ধনেতে রান্নার খুশবুতো মিলেই না উল্টে শুধু রাঁধুনীর বদনাম হয়।

আর হাই-ব্রীড বাদামের পেটেও যে চারটি পর্যন্ত সীড হয় আমরা জানতাম না। 'বাদাম' নামের তৎসম ব্যঞ্জনা নেই, কারণ শব্দটি ফার্সী। তবুও মাটির নাটই যে ইংরেজী Ground Nut এ কথাই বা কে জানত? এছাড়া বাদামের কতো প্রজাতি— Pusa-228833, স্বর্ণমুখী, Albela-007, IRRI-স্বর্ণগুটিকা। ধনের ইংরেজীও যে Coriander এটা দামবাবুর কল্যাণে আমাদের জানা হয়ে গেছে। ভাগ্যিস এই নীরস পৃথিবীতে ধনে পাতা ছিল! ধনেপাতা না থাকলে কতো লোক যে ধনে-পুত্রে মারা যেত! কতো লোক যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ধনে-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত! এটা ভেবে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে-পায়েসে-শর্বতে ধনেপাতার অকৃপণ ব্যবহার করেন দামবিবি।

এবার বাদাম! বাদাম, মানে দেশী বাদাম! ভারতের মাটিতে ফলে অথচ নাম চীনে বাদাম। ভারতীয়তাবাদ-বিরোধী এই মাল চীনদেশ থেকে এক কালে আমদানী হয়েছিল নাকি! তাই চীনেবাদাম নাম। চীনেবাদামকে 'ভারতীয়-বাদাম' নামে ডাকা বাধ্যতামূলক করা যায়। সাংসদ-মন্ত্রীরা ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারেন। এখনই সমস্যাটা 'ডেম'এ বিনাশ করা দরকার। অন্যথায় 'ইতালীয়ান-চালকুমড়ো'

বা 'রাশিয়ান-মূলো', যে কেউ লালকেল্লা কেড়ে নিতে পারে। যাক, কথা হচ্ছিল দামবাবুর চীনেবাদাম নিয়ে— চীনেম্যানদের মতোই চীনেবাদামও রহস্যজনক ফসল। চীনেদের মতোই রাখ-ঢাকটা একটু বেশী। ফুলটি ফোটে মাটির উপরে অথচ ফলখানা লুকানো থাকে মাটির নীচে। আজব ফল। পরিমাণে বেশী খেতে নেই। বেশী খেলে নওলকিশোরের মতো পেট খারাপ হয়।

বাদামের কিছুই ফেলা যায় না— বাদামের খোল, যা ছিল একান্তই পশুখাদ্য, তাতে এখন মানুষ ভাগ বসাচ্ছে। বাদামের খোল থেকেই হয় নকল সয়াবীনের সয়া-বড়ি যা খেয়ে বিজ্ঞাপনের মডেলদের শাহরুখ-কাজোলের মতো রূপ ফেটে পড়ে, আর আমজনতা পেটের রোগে ভুগে। চীনেবাদাম নিয়ে একমাত্র সুকুমার রায় ছাড়া আর কোন রসিক কবিতা লেখেননি, এটা দামবাবুই আমাদের জানান। গরুর যেমন দুধ হয়, গাড়ির যেমন দুধ হয়, বাদামেরও তেমনি দুধ হয়। (গাড়ির দুধ মানে সরকারী ডেয়ারী ফার্মের দুধ। ডেয়ারী ফার্মের গাড়িতে লেখা থাকে 'দুধের গাড়ি'। দুধের গাড়ি আর গাড়ির দুধ একই কথা। অনেকেই অম্লান-বদনে বলেন, গাড়ির দুধে চা'টা বেশ ভালো হয়।)

বাদামের দুধ খাদ্য ও পুষ্টিগুণে ভরপুর। দামবাবু 'বাদাম হইতে দুগ্ধ-দোহন' (Sucking Milk from Ground nut - By Mr. Tsian Tsian Choow) নামক একখানা বই আনিয়েছেন বেইজিং থেকে। গ্রাইণ্ডারে বাদাম পিষে, ছাকনী দিয়ে ছেকে বাদাম থেকে দুগ্ধ নিষ্কাষনেই দামবাবুর সকালবেলার আড়াইটি ঘন্টা সময় যায়। তবুই ছেদীলালের ভেজাল দুধ খেয়ে পেটের ব্যামোতে কষ্ট পাওয়ার থেকে বাঁচোয়া। কাঁচা বাদামের দুধের উৎকট গন্ধে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হত। এখন সয়ে গেছে। বাদামের গুণের শেষ নেই। সর্দিকাশিতে নাকি চীনেবাদামই মহৌষধ। চীনেবাদামের খোসায় ভালো ব্লটিং পেপারও নাকি হয়। কিন্তু বাঘের মাসির সঙ্গে চীনেবাদামের কী সম্পর্ক তার কোন বিশসাসযোগ্য কারণ দামবাবু খাঁড়া করতে পারেননি। বলেন— চীনেবাদাম ক্ষেতের নরম মাটি হয়তো বাঘের মাসির প্রাতঃকৃত্যের স্থান বা বাথরুম হিসেবে যথেষ্ট উপযুক্ত।

ঘুরে-ফিরে সন্দেশ। আবার ধনে-প্রসঙ্গ। বাদামের দামী কথা পরে আবার আসবে। ধনে পাতা বা Coriander leaves রন্ধন-শিল্পের এমন একটি উপাদান যে সারা পৃথিবীই এর গুণগ্রাহী। শুধু দাম-পরিবারকে বাহবা দিয়ে লাভ নেই। তাজ বেঙ্গল, অশোক হোটেল, গ্র্যাণ্ড হোটেলে শুনেছি এক একটা পদে শুধু ধনেপাতা পড়লেই দাম বেড়ে যায় একশো টাকার মতো। আর কী সব জবরদস্ত পদ রান্না হয় ধনেপাতায়! আহা! কী সব পদ! এসব হোটেলের মেনু-কার্ড দেখলে মাথা ঘুরে যাবে— 'স-মধু কাঁঠালবিচি-ধনেপাতার স্টু' 'করলা-ধনেপাতা' 'চিচিঙ্গা-ধনেপাতা', 'ধনেপাতার গোস্ত-বড়া', 'ধনেপাতায় ঢাকাই দোম্বা-খাসীর রেজালা', 'ধনেপাতায় শাহী-মাটন-কাবাব' 'ধনেপাতার ইতালীয়ান গোলাশ' 'রোমান পিৎজা' আরো কতো কতো বিজাতীয় পদ। যেমন নামের বাহার তেমনি স্বাদ। অবশ্য এসব আম-জনতার জন্য নয়। সাধারণ মানুষের পেটে এসব হজম হবে থোড়াই। এসব খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণভস্ম-মুক্তাভস্ম-মদ-মধু-মকরধ্বজ না খেলেই পটল তুলতে হবে। তবুও একবার চোখ বুলানো যায় আন্তর্জাতিক মানের এক পাঁচতারা হোটেল, সিঙ্গাপুরের হোটেল ধুন্ধুমার ইন্টারন্যাশনালের মেনুকার্ডে—

Menu-Card
Hotel Dhoondhoomar International
Singapore

Jack-seeds Goulash with
Honey & Coriander leaves - Rs. 230/-
(ধনেপাতার সমধু কাঁঠালবিচির সুরুয়া)
Bitter gourd in Coriander leaves paste - Rs. 330/-
(ধনেপাতায় তিক্ত-করলার মাখামাখা)
Snake-gourd Swiming in Coriander Sauce - Rs. 211/-
(ধনেরসে সঞ্চরণশীল লাউ-সাপ/সর্প-অলাবু বা চিচিঙ্গা)
Coriender leaves in Begam-khush
Mutton & Beef - Rs. 424/-
(ধনেপাতায় 'বেগম-খুশ' জল-খাসী অথবা দামড়ার মাংস ইত্যাদি)

Coriander Flavour Afgani Gosth-bara - Rs. 340/-
(ধনে-সুবাসিত আফগানি গোস্ত-বড়া)
Veg-mutton in Coriander Leaves Rs. 300/-
(ধনেপাতায় বৈষ্ণবের পাঁঠা বা গাছ-পাঁঠার গোস্ত)
Coriander Singapore Stew- Rs. 347/-
Coriander As You Like It, Coriander Italian Goulash,
Coriander Pitza, Dhakai Dhoomba Mutton Rezala
(ধনেপাতার সিঙ্গাপুরী ঝোল, ধনেপতার যেমন-খুশী, ধনেপাতার ইতালীয়ান গুলাশ,
পিৎজা ও ঢাকাই দোম্বা খাসীর রেজালা ইত্যাদি)

এসব অবশ্যই দুর্মূল্য বাদশাভোগ্য পদ; রাজা-উজীর-আমাত্য-আমলারা খান। তবে দামবিবির হাতের প্রিপারেশন একটি পদের কাছে এসব নেহাৎ রুগীর পাচন ছাড়া কিছুই না।

অন্তর্জাতিক স্তরে. কূটনৈতিক মহলেও ধনের খুব খাতির। শুধু ধনতান্ত্রিক আমেরিকাই নয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও রীতিমতো 'ধনেতান্ত্রিক'। ধনের গুণে ধনপতি রাষ্ট্রপ্রধানরাও কাবু হয়ে থাকেন। খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছিল ব্যাপারটা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ— পণ্ডিতজীর আমলে ভারত সফরে এসে Snake-gourd Swiming in Coriander Sauce খেয়ে চীনের এক মন্ত্রী নাকি ধনেপাতার গুণে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে মন্ত্রীবর এ দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে পাকাপাকি ভাবে দিল্লীতেই থেকে যেতে চেয়েছিলেন।

দুষ্টলোকেরা বলে, আসলে ধনেপাতা-টাতা এসব কিছু নয়। চীনের মন্ত্রীদের ইংরেজী জ্ঞান ভারতের মন্ত্রীদের মতোই। তাই Snake-gourd Swiming in Corіancer Sauce মানে চিচিঙ্গা আর ধনেপাতার ঝোলকে চীনের মন্ত্রী ভেবেছিলেন ধনেপাতার সাপের ঝোল বুঝি। দামবাবু এমন গুজবে বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা ধনেপাতার গুণেই চীনের মন্ত্রী মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভারতীয় নাগরিকত্ব

না পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনে দেশে ফিরে যাবার সময় এক বস্তা সুগন্ধি ধনে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিতজী দেশের স্বার্থের কথা ভেবে এ প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি করেন। ফলস্বরূপ ১৯৬২ সালে চীন তার প্রতিশোধ নেয়। পণ্ডিতজী ভাবতে পারেননি, পাকিস্তানের আনবিক হাত-সাফাইয়ের মতো চীনও ধনেবীজ হাত-সাফাই করে নিয়ে যেতে পারে। চীন নাকি এখন বিশ্বের এক নম্বর ধনে রপ্তানীকারক দেশ। এসব তথ্য আমরা দামবাবুর কল্যাণে জানতে পারি।

ত্রিপুরার দু'একটি লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কাচামাল
দামবাবুর প্রিয় লাউ-সাপ, সর্প-অলাবু অথবা চিচিঙ্গা আর বৈষ্ণবের পাঁঠা বা গাছ-পাঁঠা
সাহেবদের Snake-gourd & Veg-mutton.

তৃতীয় ধাপ

ধনেপাতার লাদেন-খুশ
ভরসা রাখুন জর্জ বুশ।

ধনেপাতা, বাদাম, নারকেল, প্রচুর পরিমাণ গোলমরিচ, ধানি লঙ্কা এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য উপকরণের সমন্বয়ে আফগানি রসুন, হিং ও কালোজিরে ফোঁড়ন দিয়ে দাম-বিবি একটা পুষ্টিকর, সরস সুস্বাদু পদ রান্না করেন। অতি সম্প্রতি পদটির একটি যুগোপযোগী নামকরণ করছেন দামবাবু। তাঁর ভাষায় এটি 'লাদেন-খুশ-তালিবান-জব্দ' 'আবার-খাবো' পদ। এর মূল রেসিপি অত্যন্ত গোপনীয়। উক্ত উপকরণ ছাড়াও 'লাদেন-খুশ' পদটি রান্না করতে আরো অনেক দুস্প্রাপ্য লোয়াজিম-মাল-মশলার দরকার হয়। দামবাবুর ধারণা, ওসামা-বিন্-লাদেন যদি কোনদিন ধরা পড়েন, এই ব্যঞ্জনটি দিয়ে চারটি স্বর্ণমশুরী চালের (ডালও মশুরী, চালও মশুরী!!) ভাত যদি তাঁকে খাইয়ে দেয়া যায়— জর্জ বুশ নিশ্চিত থাকতে পারেন এ জীবনে আর লাদেন অস্ত্র হাতে নেবেন না। সকাল বিকেল চারটি খেয়ে একটি মঘাই পান মুখে পুরে তোরা-বোরা গুহায়ই হোক আর অজন্তায়ই হোক টেনে ঘুম দেবেন। হাতি দিয়ে টেনেও তাঁকে আর কোথাও নেয়া যাবে না।

দামবাবুও এমনি একটি পদ দিয়ে চারটি ভাত খেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে একটা মঘাই-পান মুখে দিয়ে 'হায়! ...কোয়েলিয়া... মৎ কর্ পুকার্...' বেগম আক্তারের ভৈরবী ঠুংরীর একটা 'নাড়ি-কাটা-কলজে-মোচড়-দেয়া' পদ উল্টেপাল্টে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে গাইতে লিচুবাগান থেকে হেঁটে দূরসঞ্চার ভবনে তাঁর অফিসে চলে আসেন।

দাম-বাবু আগে ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। এক ছটাক জমিতে কায়ক্লেশে একটা আধা-খ্যাঁচড়া কীম্ভূত পাকা বাড়ি খাড়া করতে পারলেই আগরতলা শহরে বাড়িওয়ালারা সব নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ'র ভায়রাভাই, আলীবর্দ্দি খাঁ'র নাত-জামাই। তিন পুরুষের উদ্বাস্তু এসব বাড়িওয়ালারা তাঁদের ভাড়াটেকে মনুষ্যপদবাচ্য মনে

করেন না। বাড়িওয়ালার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দাম-বাবু এখন সরকারী কোয়ার্টারে থাকেন শহরের বাইরে, লিচুবাগান এলাকায় এক পাণ্ডব-বর্জিত মুক্তাঞ্চলে। তবুও শান্তি। বাড়িওয়ালার অত্যাচার নেই। মাথার উপর উপুর-করা গামলার মতো বিরাট বড়ো আকাশ। অকৃপণ দক্ষিণের বাতাস। খোলা-মেলা পরিবেশও দূষণমুক্ত।

দামবাবু ও দাম-বিবি লিচুবাগান এসে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারছেন। অবসর সময়টা শুধু মাইক্রোওয়েভ টাওয়ারের দিকে চেয়ে চেয়ে আর কতক্ষণ কাটানো যায়! তাই ঘরে বসেই তাঁরা সরকারী জঙ্গলে কালিদাসের 'কুরুবক্' অর্থাৎ কুরচী ফুল, রবীন্দ্রনাথের 'অমলতাস' অর্থাৎ সোঁদাল ফুল, জীবনানন্দের না কি বিভূতিভূষণের 'বন-কলমী' ও 'ঘেঁটু' ফুল আর ত্রিপুরার জঙ্গলের একান্ত নিজস্ব প্রাকৃতিক বারুদ বা অস্ত্র, গাছে গাছে সোনালী-রূপোলী ভেলভেটের মতো সিম-জাতীয় ফল, দেখতে-সুন্দর-ছুঁয়ে-মুশকিল 'বান্দরের ওল' বা মর্কট-ফলের শোভা দেখেন। তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে মেঘদূত আর রবি ঠাকুরের বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করেন! দামবাবু শ্রীদাম-সঙ্গীত আর দামবিবি রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও চর্চা করেন। 'দূরসঞ্চারিকা'র জন্য সরস গল্প-প্রবন্ধ লেখেন।

এছাড়াও অহল্যা-উদ্ধার তথা অনাবাদি ভূমি আবাদের সূত্রে ত্রিপুরার অনেক অজানা গাছ-গাছড়ার সাথে পরিচয় হয়— যথা ভেসজ মইরচা, শরবতের তুমকা, পিছলী, বন-তুলসী, গরীবের জ্বালানী রিফ্যুজীলতা, হেকিমী আম-হলুদ, কবিরাজী 'ভাদাইল্যা' ঘাস, কাঁটানটে আর সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর নিষিদ্ধ ফল 'বান্দরের ওল'! (এক বার গায়ে লাগলে আল্‌কায়দা, কাবুলীওয়ালাও তুর্কী নাচন নাচবে।) আরো আছে সীতার-গয়াম অর্থাৎ টক-মিঠে বন-পেয়ারা, সুস্বাদু টেক্‌রই, সীমান্ত-আলু ট্যাপিওকা, কাঁচায় সবুজ, পাকলে কালো, প্রমাণ-সাইজের লাঠির মতো এক প্রকার ফল 'বান্দরের লাঠি' (সোঁদাল গাছের ফল)। এসব বস্তুর সঙ্গে লিচুবাগান এসেই পরিচয় দামবাবুর। মাইক্রোওয়েভ টাওয়ারে, লিচুবাগানের গাছে গাছে দামবাবুর দেশ-বাড়ির 'কটা' তথা আগরতলার 'চলই' তথা কাঠবিড়ালীর নাচ দেখে, হট্টি-টি-টি পাখীর গান শুনে দিব্যি সময় কাটে তাঁদের।

আমরা আগেই বলেছি এখন শীতকাল মানে সুখের সময়। শীতকালে দাম-বিবির রান্নার হাত আরো দরাজ হয়। দাম-বাবু রোজ লেক-চৌমুহনী বাজারে বাজার করেন। ভোজন-বিলাসী সৌখীন মানুষ, একটু বেশী সময় নিয়েই বাজার করেন। সাধারণতঃ সেই ধনেপাতা-পেস্তা-বাদাম আর বাদাম-পেস্তা-ধনেপাতার মতো আইটেমই আগে কেনেন।

মাঝে মাঝে ওস্তাদী-কালোয়াতী গায়কেরও তাল কাটে; গলার সুর বেয়াদবি করে, টিউশনি-পাগল অঙ্কের স্যারও অঙ্ক ভুল করেন। অ্যাল্‌জাইমার দোষ না থাকলেও দামবাবুরও একটু ভুলোমন; তাঁরও ভুল হয়। তবে এমন ভুল দামবাবু খুব একটা করেন না। এটা খুবই গর্হিত অপরাধ। যে কারণে আজ দাম-বিবির মেজাজ কিঞ্চিৎ উষ্ণ। দাম-বাবু ধনে পাতা আর বাদাম আনতে ভুলে গেছেন এমনটি কখনো হয়নি। আজ কেন যে এমন হল! কেন ভুল করলেন? ভুল করবেনইতো। দামবিবি অনুযোগ করে বলেন— আক্তারী বাঈয়ের ঠুংরী গাইতে গাইতে যিনি পথ চলেন, স্থায়ী-অন্তরা-আলাপ-বিস্তার, তান-তোড়া-মীড়-ঝালা-গৎ-লয়করী আর দাদরা-খেমটা-আড়খেমটা-তিনতাল-দীপচঁদী-কাহারবার চুলচেরা বিচার করে যিনি পথ চলেন তাঁর কি সামান্য বাদাম আর ধনে পাতার কথা মনে থাকে? তাই ধা-ধিন্‌-ধিন্‌-ধা, না-তিন-তিন-তা'র বোলের সাথে চী-নে-বা-দা-ম-ধ-নে-পা-তা, চী-নে-বা-দা-ম-ধ-নে-পা-তা অনেক সময় ঠিক ঠিক মিলে না।

অগত্যা দাম-বিবির উষ্ণতা প্রশমনের জন্য দাম-বাবু শিগগীরই সস্ত্রীক শ্বশুড়ালয় শিলং যাবার বাসনা ব্যক্ত করেন। পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য বাবু রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মার-কাটারী টপ্পার দুটো লাইন না গেয়ে পারেন না—

যাব নুতন শ্বশুড় বাড়ি ...
ওগো! আহ্লাদে যাই গড়াগড়ি!
জড়িপেড়ে কাপড় চাদর, পাঞ্জাবীতে মাখব আতর।
বুকপকেটে ঝুলিয়ে নেব সোনার চেন আর সোনার ঘড়ি
যাব নুতন শ্বশুড় বাড়ি...

কিন্তু গানে দামবিবির মান ভাঙ্গে না। ধনেপাতার 'লাদেন-খুশ' রান্না না হলে মেজাজ খুশ হয় না। দামবিবি 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ'এ পড়েছেন, স্বামীজী বলেছেন— যে ভালো রাঁধতে জানে না, সে ভালো সাধু (সাধ্বীও) হতে পারে না। মন শুদ্ধ না হলে রান্না সুস্বাদু হয় না।' স্বামীজীর কথা শিরোধার্য। কিন্তু ধনে বা ধনেপাতা ছাড়া কি ভালো রান্না হয়? এ ব্যাপারে খাদ্যরসিক স্বামীজীতো কিছুই বলেন নি!

লিচুবাগান এমনি একটি কাবুল-কান্দাহার এলাকা যে চট্ করে আবার লেক-চৌমুহনী বাজারে গিয়ে ধনে পাতা, বাদাম নিয়ে আসাও দামবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। ধনে পাতার কী দাম রে বাবা! দাম শুনে দামবাবুর মাথা ঘুরে যায়। কোন 'পরাজিত প্রতিনিধি' বা বসে-যাওয়া-বিধায়ককে মাথায় বসিয়ে, চেয়ারম্যান করে, একটা মাথা-ভারী সংস্থা 'ত্রিপুরা ধনে-বিকাশ নিগম লিমিটেড' বা Tripura Coriander Development Corporation Ltd. (TCDCL)'র মতো লাভজনক প্রতিষ্ঠান গঠন করে বেকার সমস্যা দূর করা যায় না? ত্রিপুরার মানুষের 'ধইন্যা'-প্রীতি কম? বাজারে গিয়ে 'ধইন্যাপাতা' বা ধনেপাতা কিনবে না এমন লোক কমই দেখা যায়। অথচ ধনে উৎপাদন কোথায় তেমন? ধনেপাতার কী দাম! তিরিশ টাকা শো; মানে তিনশো টাকা কে.জি.।

Traditional apparatus
অবলুপ্তির পথে উদুখল-মুষল বা ত্রিপুরার গাব-কাঠের 'গাইল-ছিয়া'।

চতুর্থ ধাপ

চল্ কোদাল চালাই ভুলে মানের বালাই।
ঝেড়ে অলস-মেজাজ হবে শরীর ঝালাই।
—গুরুসদয় দত্ত।

ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবক্তা দেশপ্রেমিক আই.সি.এস., স্বর্গীয় গুরুসদয় বাবুর কথা আমরা দামবাবুর কাছেই প্রথম শুনি। গুরুসদয় বাবু অলস ব্যক্তিদের প্রতি খুব সদয় ছিলেন না। তিনি বলেছেন অলস বসে না থেকে কোদাল চালাতে। লিচুবাগানের অহল্যাভূমিতে কোদাল চালানো কী কঠিন কাজ গুরুসদয় দত্ত বেঁচে থাকলে দামবাবু চিঠি লিখে জানাতেন। যাক, দামবাবু লিচুবাগানের সরকারী পতিত অহল্যাভূমিতে ধনেপাতা ও বাদাম চাষের প্রকল্প হাতে নেন। কাঙ্করময় এই ভার্জিনভূমি আবাদ করতে তাঁর মাথার ঘাম পায়ে পড়ে এবং পায়ের ঘাম মাথায় উঠে। কায়িক পরিশ্রমে, অনভ্যাসজনিত কারণে দামবাবু রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েন। তবু দামবিবির উৎসাহে ও বাজারে ধনে পাতার ক্রমঃবর্ধমান উর্দ্ধগতির অগ্নিমূল্যে উৎসাহিত হয়ে বিশ্বম্ভর পাল ওরফে 'কমাণ্ডো' নামধারী কার্টুন-টাইপের স্থানীয় একজন মজুর নিয়োগ করে অগত্যা সরকারী জমিকে বশে আনেন।

এখন সেচের জলের সমস্য দেখা দেয়। সরকারী আবাসনে ভাড়াটিয়া-মালিক অর্থৎ চোরে-কামারে দেখা-সাক্ষাৎ নেই যদিও— কিন্তু মরুময় আফগানিস্তান লিচুবাগানে পানীয় জলে ধনেপাতা চাষ একটা রাজকীয় বিলাসিতা; এটা সম্ভব নয়, প্রতিবেশীদের ঘোরতর আপত্তি থাকতে পারে ধরে নিয়ে জলসেচের জন্যও একটি লোক নিয়োগ করেন। এদিকে বাজারে ধনেপাতার আকাল! প্রচণ্ড কুয়াশায় চাষীর ধনেপাতা রীতিমতো মাঠে মারা গেছে সব। বাজারে ধনেপাতা একশো গ্রামের দামই চল্লিশ টাকা অর্থাৎ চারশো টাকা কে.জি.। দামবাবু পাড়ার দোকান থেকে এক কে.জি. ধনে মাত্র তিরিশ টাকায় এনে এক শুভলগ্নে, মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর জমিতে ছিটিয়ে দেন। তারপার ক্যালকুলেটর নিয়ে হিসেব করে দেখেন এই সামান্য জমিতে যে ধনে পাতার ফলন হবে তার বাজার দর প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্মণি... কথাটা মিথ্যে নয়।

এদিকে প্রায় পক্ষকাল অতিক্রান্ত। শীত তেমন না পড়লেও বাজার ছেয়ে গেছে ধনেপাতায়। ধনেপাতার দর হুড় হুড় করে পড়ে যাচ্ছে। দামবাবুর জমিতে লাজুক ধনে গাছের টিকিটিরও দেখা নেই। সকাল বিকেল দামবাবু পর্যবেক্ষণ করেন, দুপুরে ফোনে দামবিবির কাছে খবর নেন সাঙ্কেতিক ভাষায়, যাতে সতীর্থরা ব্যাপারটা না বুঝে ফেলে আবার। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এতো পরিচর্যার পরেও অভিমান! ধনেরা, ধনেপাতারা এমন লাজুককে জানত?

কুড়ি দিন পর একজন মুখ চেনা কৃষি-বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করে কারণটা জানতে পারেন। সীড বা বীজই চাষের আসল গোমর। পাড়ার দোকানীর ধনে হয়তো গতশতাব্দীর স্টক ছিল, কিছু পোকায় খাওয়া আর বাকিটা অঙ্কুর উদ্‌গমের পক্ষে প্রতিকূল ছিল বলাই বাহুল্য। এভাবে প্রথম প্রচেষ্টাটি সরকারী মাঠেই মারা যায়। কিন্তু দামবাবু দমবার পাত্র নন। এখনো বাজারে ধনেপাতা কুড়ি টাকা কে.জি. অর্থাৎ দু'টাকা শো। আবার যদি বপন করা যায়, অন্তত পরিচিত কৃষি-বিশেষজ্ঞের মতে কুড়ি দিনের মাথায় ধনে পাতার ফলন ঘরে তোলা সম্ভব। দামবাবু সরকারী সীডলিং ষ্টেশন থেকে এবার বীজ সংগ্রহ করেন একশো পঁচিশ টাকা কে.জি. দরে। আর দামবিবির পরামর্শে, এক যাত্রায় কিছু বাদামের বীজও কিনে আনেন। ধনের সাথে মিশ্রচাষ হিসেবে বাদাম যদিও কৃষি-বিশেষজ্ঞ অনুমোদন করেন না তবুও বিবির অনুরোধ তিনি ঠেলতে পারেন না। যথারীতি আবার বপন, আবার বারি সিঞ্চন, আবার শর্বরীর প্রতীক্ষা। এবার সত্যি সত্যিই শুধু ধনেপাতা নয় গোল-গোল গাঢ়-সবুজ ছোট ছোট পাতার বাদাম গাছেরও মুখ দেখলেন দামবাবু। অবশ্য বাজারে দ্রুতগতিতে দাম পড়ে যাচ্ছে ধনে পাতার, বাদামও বাজারে দুর্মূল্য নয়। এখন এক টাকায় এক কাঁড়ি ধনেপাতা জোর করে গছিয়ে দেয় দোকানী। এক টাকার খুচরো কিছুতেই ফেরৎ দেবে না কোন দোকানী। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ধনেপাতা নিতে হয় এক টাকার। আবার একটাকার নোটের বদলে ধনেপাতা নিতে চায় না কোনও সব্জীওয়ালাই। এ নিয়ে বাজারে বাক-বিতণ্ডা-হাতাহাতি হয় প্রায়ই। যাক, বিলম্বে হলে ধনেপাতর মুখ দেখে দামবিবিও খুশী। লাভের জন্যতো আর চাষ করা নয়! নিজের হাতে একটা সব্জী ফলিয়ে তার স্বাদ যাচাই করার স্বাদই আলাদা।

পঞ্চম ধাপ

রামছাগল আর রামলাল
নওলকিশোর-ছেদিলাল।

এক রঙচঙে বিকেলে টেলিফোনে মরাত্মক সর্বনেশে খবরটি পান দামবাবু। দামবিবি তাঁকে জানান, এক-পাল ধেড়ে ছাগল তাঁদের অগুনতি সন্তানাদি নিয়ে তাঁর সাজানো বাগান তছনছ করে দিচ্ছে। এদেরকে তাড়ানো যাচ্ছে না। ছাগল বলে কথা। এরা পরমানন্দে কচি কচি ধনে পাতা খেয়ে নিচ্ছে। বিনিময়ে অবশ্য কালো কালো আয়ুর্বেদিক বটিকার মতো প্রচুর পরিমাণ বর্জ্য বা 'নাদি' রেখে যাচ্ছে ক্ষেতে। পরবর্তী ফসলের সময় তা সার হিসেবে কাজে লাগবে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষতি হচ্ছে প্রচণ্ড।

ধনেপাতা ও বাদাম যে ছাগল-প্রিয় ফসল এ কথাটি দামবাবুর চিন্তায় ছিল না। ছাগলের রুচিবোধ সম্পর্কে হয়তো একটা অবজ্ঞার ভাব তাঁর ছিল। ছাগলেরা তার প্রতিশোধও নিতে পারে। যাক, বাড়ি গিয়ে দামবাবু ছাগলের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ছাগলের মালিকের বিরুদ্ধে অইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এ ছাগলের পালের মালিক স্বয়ং রামলাল ধানুক। রামলাল যে সে ব্যক্তি নন। সিঁধেল চুরি দিয়ে ইনি কেরিয়ার শুরু করেন। দলবদলে পারঙ্গম ইনি বর্তমানে একটি দলের ছত্রছায়ায় রীতিমতো জনপ্রতিনিধি। রাজনীতি সচেতন গ্রাম ঘুড়ঘুইড়া মুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের তিনি উপপ্রধান। লিচুবাগান থেকে দশমিনিটের পথ আদরিণী চা বাগানের ওদিকটায় রামলালজীর মকান। ক্রমাগত তাঁর ছাগলের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন দামবাবু স্কুটার নিয়ে তার ডেরায় হাজির হন। রামলালজী দামবাবু দূরসঞ্চার বিভাগের কর্মী জেনে তাঁকে খুব খাতির যত্ন করেন প্রথমে। তারপর দামবাবুর আগমনের হেতু জানতে পেরে স্বমূর্তি ধারণ করেন। অত্র এলাকায় রামলাল ও রামলালের ছাগল বাহিনীর উপর কথা বলে এমন লোক আছে জেনে তিনি আহত হন। শুধু তাই নয়, রামলালজী লক্ষ্য করছেন, অতিরিক্ত ধনেপাতা ভোজনজনিত কারণে তাঁর ছাগলদের গা থেকে বিটকেল

ছাগুলে-গন্ধটা বিলকুল লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এটাও তাঁর চিন্তার কারণ। এজন্য যে দামবাবুই দায়ী, তার দায়ভার একদিন দামবাবুর উপর বর্তাবে এমন শাসানিও তিনি দামবাবুকে দেন। আগামী বকরি-ঈদের সময় এই ছাগলের পালটা বেচে দেবেন রামলাল। এখন ধনেপাতার গন্ধ-ওয়ালা ছাগলের পালের যদি গ্রাহক না মিলে তার ক্ষতিপূরণ দামবাবুকে দিতে হবে এমন দাবীও করেন। প্রয়োজনে ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক রঙ দিতেও রামলাল ইতস্তত করবেন না। কারণ সংখ্যালঘু ও দলিত নির্যাতনের এটা একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেন্দ্রীয় কোন্ সিকি-মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর জান-পহ্চান ও কুটুম্বিতা আছে তাও আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন ঘুড়ঘুইড়্যা মুড়ার দলিত-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, ক্ষমতাসীন উপপ্রধান রামলাল ধানুক।

রামলালের ধমকে ঘাবড়ে যাবার পাত্র নন দামবাবু। যত রামলাল-ছাগল তাঁর সাধের ধনেপাতা খেয়ে যাবে তা হয় না। দামবাবু পরদিন কেজুয়েল লিভ নিলেন। তল্‌তা বাঁশ অর্থাৎ ত্রিপুরার মুলি বাঁশ কিনে এনে ধনেবাগানে বেড়া দেয়ার উদ্যোগ নিলেন। 'কমাণ্ডো' ওরফে বিশ্বম্ভর পাল নামে জমি তৈরী, সেচ-কর্ম ও ধনে-বাদাম চাষের সহায়ক তাল-ঢ্যাংগা লোকটি সর্ববিদ্যা বিশারদ। একদিনের হাজিরায় ধনেবাগানে ছাগল-প্রতিরোধক বেড়া তৈরী করে ফেলে। অবশ্য এজন্য দামবাবুর পকেট থেকে নগদ তিনশোটি টাকা খসে যায়। তা যাক। তবু রামলাল-ছাগলের উপদ্রব থেকে আপাতত রক্ষা পেল তাঁর সাধের ধনেপাতা আর বাদাম।

আরো পক্ষকাল কেটে গেছে। এখন ধনেপাতা বাজারে গড়াগড়ি যায়। বাজারে ধর্মের ষাড় অর্থাৎ মহাদেবেরা ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-ডিনার-অতিথি আপ্যায়ন (হ্যাঁ! যার যার পছন্দের মহাদেবীরাইতো অতিথি!) সবই করে ধনেপাতায়। দামবাবুর পরিচিত ধর্মের ষাড় নওলকিশোর। তাকেও দেখেন মাঝে মাঝে লেক-চৌমুহনী বাজারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধনে পাতা চিবুচ্ছে। এই নওলকিশোরের কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। সে ছিল ছেদিলাল যাদবের এঁড়ে বাছুর। গুর্খাবস্তি-কুঞ্জবন এলাকায় দামবাবু যখন ভাড়াটে ছিলেন, ছেদিলালের ডেরা থেকে রোজ দুধ নিতেন। ছেদিলালের গাই ছবিলীরাণী— ছবিলীরাণীর প্রথম এঁড়ে-সন্তান নওলকিশোর। ছেদিলালেরা এঁড়ে বাছুর অর্থৎ ছেলে-গরু পছন্দ করে না। ছেলে-গরুরা অর্থাৎ দামড়ারা দুধ

দেয়না এটা দামবাবুও বুঝেন। তবুও নওলকিশোরকে বড় হতে দেখেছেন দামবাবু। এখনো নওলকিশোর তাঁকে চিনতে পার। বাজারের মুখটায় দেখা হলে হাসি হাসি মুখে চেয়ে ফোঁস্-ফোঁস্ করে দামবাবুকে গুড মর্নিং বা নমস্তে জানায়।

আমরা আমাদের গল্প আর দীর্ঘায়িত করব না। বাজারে ধনেপাতার ক্রেতা পাওয়া কষ্টকর। এখন নওলকিশোরেরাও ধনেপাতা খেতে চায় না। দরও ড্যাম্-চিপ, আশী পয়সা কে.জি.। তবে প্রায় হাজার খানেক টাকা খরচ করে দামবাবু প্রচুর ধনে ফলিয়েছেন। কোমর সমান উঁচু ধনেগাছের সাদা ফুলের সুগন্ধে লিচুবাগানের বাতাস ভারী। বাজারের মৌমাছিরা গুড়ের নাগড়ী ও মিছরি-বাতাসার মোহ ত্যাগ করে সারাদিন দামবাবুর ধনেবাগানে গুন্‌গুন্ করে। বড়ো বড়ো দূরসঞ্চারী অফ্‌সরেরা এমন কী রাশভারী বড়োসাহেব মানে খোদ জি.এম. সাহেবও দামবাবুর নিষ্ঠা-শ্রম-সৌন্দর্য বোধের প্রশংসা করেন। এদিকে দামবিবিও দুবেলাই তাঁর 'লাদেন-জব্দ-তালিবান-খুশ' পদটি রান্না করেন; দামবাবু পরিতৃপ্তি সহকারে খান। মনটা উৎফুল্ল থাকলে আবার ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান সাহেবের জংলা-ভৈরবী ঠুংরীর একটা টুকর মনে পড়ে — 'নয়ন মোরে তরস্ রহে, আ যা বালম্ পরদেশী... হায় রাম... আ যা বালম্ পরদেশী' মন-পসন্দ্ গানটি গাইতে গাইতে দামবাবু লিচুবাগান থেকে কামান-চৌমুহনীর অফিসে চলে আসেন।

ত্রিপুরার জঙ্গলের প্রাকৃতিক বারুদ 'বান্দরের ওল্'
আর মগডালের নৃত্যশিল্পী, দামবাবুর 'ক্কটা' বা আগরতলার চঞ্চল 'চলুই'।

অন্তিম ধাপ

নওলকিশোর কুপোকাৎ
দামবাবুর মাথায় হাত।

কিন্তু অবিমিশ্র সুখ কারো কপালে সয় না। দামবাবুরও সইল না। সেদিন ভোরবেলা একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখছিলেন দামবাবু। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ. কে. সাতচল্লিশ হাতে নিয়ে একা একাই তোরাবোরায় গিয়ে লাদেনকে প্রায় কব্জা করে এনেছেন— ঠিক এমনি সময়ে দামবিবির আর্তনাদ। হতভম্ব দামবাবু লাফিয়ে উঠেন বিছানায়। ঘুম-চোখে দাববিবির ইঙ্গিতে ধনেক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখেন ধনেবাগানে স্বয়ং মূর্ত্তিমান নওলকিশোর দাঁড়িয়ে। দামবাবুকে দেখে ঘাড় নুইয়ে প্রাতঃপ্রণাম জানাচ্ছে। দামবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। নওলকিশোরের হাসি হাসি মুখটা দেখে দামবাবুর পিত্তি জ্বলে যায়। হায়! হায়!! এতো সাধের ধনেপাতা! হায় 'লাদেন-জব্দ-তালিবান-খুশ' ধনেপাতার পদ। দামবাবুর কান্না পায়! সারা বাগান তছনছ।

নওলকিশোর যে এমন নিমকহারাম কে জানত? সেদিন বাজারের মুখটায় তার সাথে দেখা। ছবিলীরাণীর ছেলে গায়ে-গতরে এতো বড়ো হয়েছে দেখে খুশীই হন দামবাবু। লোভী ছেদিলাল যাদব এক ফোঁটা দুধ খেতে দিত না নওলকিশোরকে। নওলকিশোরকে বসিয়ে খাওয়ানো ছেদিলালের মতো কঞ্জুস ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবও ছিল না। ক্ষেতিবাড়িও নেই ছেদিলালের যে এঁড়েটো বড়ো হয়ে হাল টানবে। ছেদির ইচ্ছে ছিল নওলকিশোর যেন মরে যায়। সত্যপীরের সিন্নি মানত করেছিল এঁড়েটোর মৃত্যু কামনায়।

ছবিলীরাণী যখন দ্বিতীয়বার অন্তসত্বা, অপ্রাপ্তবয়স্ক নওলকিশোরের গলায় একটা সদ্য কেনা লাল শালু কাপড় বেঁধে কামানচৌমুহনী এনে ওকে ছেড়ে দিয়ে যায় ছেদিলাল যাদব। সেই থেকে শিক্ষানবিসী মহাদেব নওলকিশোর দোকানীদের অত্যাচার, স্বজাতীয়দের গুঁতো, কুকুরের কামড়, মিষ্টির কারিগরেব

ছিটানো গরমজল, প্রচণ্ড ট্রাফিক-জ্যামে শ্লথ-গতি তাকে উদ্দেশ্য করে শাঁখা-পড়া-ক্ষয়াটে স্বাস্থ্যের মেয়ে-ট্রাফিক পুলিশের আপত্তিকর-মুখ-খারাপ গালাগাল এসব সহ্য করে অনেক কষ্টে মানুষ হয়। এসব নিত্যনৈমিত্তিক অপমানজনক দৃশ্য দামবাবুর নিজের চোখে দেখা।

কৃষ্ণের জীব নওলকিশোরের প্রতি একটু স্নেহ তাঁরও ছিল। পাশের দোকান থেকে একটা বাসি পাউরুটি কিনে নওলকিশোরকে খাইয়েছিলেন তিনি। ঐ দোকানীটিই তাঁকে জানায়— নওলকিশোর এই চালানী পচা ধনেপাতা আর খেতোয় না। গত চারদিন যাবৎ ও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখানে। নিরম্বু উপবাস। জলও খায় নি। আজ দামবাবুর দেয়া পাউরুটিতে অনশন ভঙ্গ করল। তারপর কৃতজ্ঞ নওলকিশোর (দামবাবুর তাই মনে হয়েছিল) তাঁর পিছু পিছু লিচুবাগান পর্যন্ত এসে এই সরকারী আবাসন তথা দামবাবুর বাড়ি চিনে গেছে। দামবাবু ব্যাপারটা হয়তো খেয়ালই করেননি।

আজ নওলকিশোরের কাণ্ড দেখে রাগে কাঁপতে থাকেন দামবাবু। বেড়া ভেঙ্গে রাত ভর সারা বাগানের ধনেপাতা কিছু খেয়েছে বাকিটা মাড়িয়ে ছিঁড়ে নষ্ট করেছে। ধনেবাগানেই কয়েক দফায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছে। অনেকদিন পর দেশী ধনেপাতা আর বাদামের মতো এই উপায়দেয় খাবার খেয়ে এখন ঢেকুর তুলছে। পরিতৃপ্তির জাবর কাটছে আর থেকে থেকেই তরল গব্য ত্যাগ করছে। কঁচি ধনেপাতা আর বাদাম পাতায় বোধ হয় পেটে ছেড়ে দিয়েছে নওলকিশোরের। দামবাবু একটা বাঁশ এনে নওলকিশোরকে উত্তম-মধ্যম দেয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। দামবিবি তাঁকে নিরস্ত করেন কিছুদিন আগে কের-চৌমুহনী এলাকায় এক ভদ্রলোক যে ভাবে মহাদেবের আক্রমণে প্রাণ হারালেন তা দামবাবুকে স্মরণ করিয়ে। যতই বলবান হোন না কেন, খালি হাতে খালি মাথায় অর্থাৎ শিংবিহীন অবস্থায় বিশালবপু নওলকিশোরের সাথে টেক্কা দেয়া সম্ভব নয় জেনে অগত্যা দামবাবু রণে ভঙ্গ দেন। সব ভবিতব্য ধরে নিয়ে নওলকিশোরের মুণ্ডুপাত করে এক সময় বিষণ্ন মনে ধনেপাতার শোক হৃদয়ে নিয়েই তিনি অফিসে বেড়িয়ে যান।

সেদিন অফিসে দামবাবুর তেমন কাজের চাপ ছিল না। একজন উৎসাহী সুন্দরী গ্রাহক (না কি গ্রাহিকা), 'মনসা' কৈরালার মতো দেখতে, ইন্টারনেট্ পরিষেবা সংক্রান্ত একটা সরল অথচ জটিল ব্যাপার বুঝতে এসেছিলেন। মনসাদেবীটি বিদায় নিতেই দামবাবুর মানটা বেশ ফুর্‌ফুরে হয়ে গিয়েছিল। আপন মনে ফৈয়াজ খান সাহেবের গাওয়া জৌন্‌পুরীর একটা ছোট খেয়ালের কলি 'বাজুবন্দ্ খুলে খুলে যায়...' গুন্‌গুন্ করে গাইছিলেন। ঠিক এমন সময়ে দামবিবির একটা টেলিফোন পেয়ে দামবাবু রীতিমতো ঘাবড়ে যান।

ব্যাপারটি গুরুতর! নওলকিশোর ধনেবাগানে শুয়ে পড়েছে! শুধু তাই নয়, এই কাঁচি দেশী ধনেপাতা সঙ্গে উঠতি গোড়াসহ বাদাম-পাতা খেয়ে হরদম দাস্ত করে (জ্বরও আছে কি না, কে জানে!) তার যাই-যাই দশা। পেট ফুলে জয়ঢাক। চক্ষু ছানাবড়া। মহাদেব শিবনেত্র হয়ে আছেন। এখন এই ধর্মের ষাড় যদি সরকারী জমিতে ইহলীলা সম্বরণ করে, এই বিশমণি লাশের কী হবে? আর গোহত্যাজনিত পাপের দায়ই বা কে নেবে? প্রতিবেশীরা, অফিসারেরা ধনে চাষের জন্য যাঁরা এই সেদিন মাত্র দামবাবুকে বাহবা দিয়েছিলেন, সবাই এখন দামবাবুর মুণ্ডুপাত করছেন! কে বলেছিল দামবাবুকে সরকারী জমিতে বাদাম আর ধনেপাতার চাষ করতে?

চিন্তিত দামবাবু তড়িঘড়ি আধা-দিনের কেজুয়েল লিভ নিয়ে বাড়ি আসেন। এসে দেখেন প্রচুর দর্শনার্থী ফোকটে তামাশা দেখার জন্য হাজির। অপরাধীর মতো মুখ করে দামবাবু নওলকিশোরের মুখোমুখি হন। নওলকিশোরও তাঁকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়। করুণ চোখে দামবাবুর দিকে তাকায়। কৃতকর্মের জন্য বোধ হয় ক্ষমা প্রার্থনা করে। এদিকে জনৈক উৎসাহী দর্শক পরামর্শ দেয়, নওলকিশোরের চিকিৎসা শুরু করার জন্য। আর এটা দামবাবুরই নৈতিক দায়িত্ব এ কথাটাও মনে করিয়ে দেয়। নওলকিশোর যদি এন্তেকাল করেন, তার মরদেহের বিলি-বন্দোবস্ত অর্থাৎ অন্তেষ্টির কী উপায় হবে এ নিয়েও কিছু দায়িত্বশীল আবাসিক দূরসঞ্চারী অফিসার ভাবনায় পড়ে যান। ব্যাপারটা শেষতক জেনারেল ম্যানেজারের বাংলো পর্যন্ত যদি পৌঁছে তাহলে কী অঘটন ঘটতে পারে এটা ভেবেও অনেকে শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ঈশ্বরের দূত একজন বিষয়ী লোক এসে দামবাবুর পাশে দাঁড়ান। বলেন, বাড়িতে গোহত্যা হলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মহাপাতকী হতে হয়, রৌরব নরকে পঁচে মরতে হয়। তিনি পরামর্শ দেন, প্রাথমিক ইলাজ হিসেবে আপতত গোটা পঞ্চাশেক প্যাকেট ইলেকট্রল এক গামলা জলে গুলে নওলকিশোরকে খাইয়ে তার দাস্ত বন্ধ করা দরকার। কিন্তু কে খাওয়াবে নওলকিশোরকে দাওয়াই? কার এতো সাহস আছে? তারপর, এই সেদিন এক ভদ্রলোক রামনগরে মহাদেব-পিষ্ট হয়ে বেঘোরে মারা গেলেন। পথে-ঘাটে ঘাতক মহাদেবদের উপর পাবলিক খুব খাপ্পা এমনিতেই। আবার মহাদেবের ইলাজ? আর পঞ্চাশ প্যাকেট ইলেকট্রলের দাম কতো? কে দেবে পয়সা?

অগত্যা নওলকিশোরের পূর্বাশ্রমের গার্জেন তথা জি. বি. হাসপাতালের সাফাই-কর্মী-কাম-দুগ্ধ ব্যবসায়ী ছেদিলাল যাদবের সরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখেন না দামবাবু। দামবাবুর আশা, যেহেতু নওলকিশোর ছেদিলালেরই ষাড়, এই দুঃসময়ে ছেদিলাল কিছুটা দায়িত্ব নেবে। গাঁটের কড়ি খরচ করে দামবাবু অটোরিক্সা ভাড়া করে গুর্খাবস্তি-কুঞ্জবনে ছেদিলালের বাড়ি যান। গিয়ে দেখেন ছেদিলাল বাড়ি নেই। এক পার্টির দাদার সাথে সরকারী অনুদানের ফডার, মানে কম পয়সার গোখাদ্য আনতে গেছে আর. কে. নগর ফার্মে। আসার পথে গোলবাজার থেকে খাঁটি দুগ্ধশিল্পের কাঁচামাল, অর্থাৎ বাটার অয়েল, ফেনি-বাতাসা, তেঁতুল, খোল আর হর্মোন ইঞ্জেকশন এসব নিয়ে ফিরতে মাঝরাতও হতে পারে।

ছেদিলালের বাড়িতে চড়ুই পাখীর মতো আকৃতির এক একটি মশার কামড় খেয়ে পঞ্চ-গব্যের উৎকট গন্ধের মধ্যে অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পর ছেদি এবং ছেদির স্যাঙাৎ বাড়ি ফিরে। দারু-তাড়ি-গাজা-ভাঙ খেয়ে টালমাটাল-বেসামাল অবস্থা। প্রথমে দামবাবুকে তার পুরানো কাষ্টমার হিসেবে বেশ খাতির যত্ন করে। রাত দুপুরে লস্যি খাওয়ার আমন্ত্রণও জানায়। তারপর দামবাবুর বক্তব্য তথা আসল বিত্তান্ত শুনে নওলকিশোরের আদ্যশ্রাদ্ধ শুরু করে। হারামজাদা এখনো বেঁচে আছে শুনে বেশ হতাশ হয়। মনে মনে নওলকিশোরের মৃত্যু কামনা করছিল

সে এ কথাও জানায়। তার এখন অর্থের বড়ো টানাটানি। যদি নওলকিশোর মরে তার খালটা অর্থাৎ চামড়াটা বেচে এই দুঃসময়ে ছেদির হাজার খানেক টাকা আমদানী হবে। এখন নওলকিশোর যদি দেহ রাখে ছেদিলালের উপকারই হয়।

কিন্তু সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে। নওল মরবার পাত্র নয়। এর আগে একবার গোলবাজার এলাকায় অতি মাত্রায় গুড় ও লবনের গাড়ি চেটে যাই যাই দশা হয়েছিল। ছেদি আর তোকারাম তৈরীই ছিলেন। কিন্তু নিমকহারাম নওলকিশোর দুদিন বাদেই খাঁড়া হয়ে দাঁড়ায়। ছেদিলালের স্যাঙাৎ তোকারাম ঋষিদাস, তিনিও জি.বি. হাসপাতালের সাফাই-কর্মী। অতিরিক্ত দারুপান-জনিত কারণে ইদানিং 'দেওটি' করতে পারেন না। নোকরিটি মাঝে মাঝে গিরবি রাখেন দেশওয়ালী ভাই খরপদ বাজপাই'র কাছে। খরপদই তার বদলা ' দেওটি' করেন। উপস্থিত তুকারামজী 'পুলটিশ' করেন। যাক, সে ভিন্ন কাহিনী। আজ তিনি একটু বেশীই তরল পান করেছিলেন, তিনি আক্ষেপ করছিলেন, নওলের স্বভাব-চরিত্র নাকি ভালো ছিল না। সব্জী-ব্যাবসায়ীদের প্রতিহিংসার কারণে নওলকিশোরের পশ্চাদ্দেশে একটা বড়ো পোড়া ক্ষত আছে। এ জন্যে ওর 'খাল'টার উপযুক্ত দাম পাওয়া যাবে না।

তোকারামজী দামবাবুকে সাহায্য করতে রাজী ছিলেন। সরকারী নোকরী করলেও তিনি তাঁর প্রাক্তন বৃত্তি ভুলেননি। তাই এক্ষুণি গিয়ে জ্যান্ত নওলকিশোরের 'খাল্ খিঁচে লিতে' স্যাঙাৎ তোকারাম এক পায়ে খাঁড়া ছিলেন। শুনে দামবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। যাক, শেষপর্যন্ত শুধু পাপের ভয়ে ছেদিলাল তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে সংযত করে। তবে কুলাঙ্গার নওলকিশোরের জন্য তার কোন দয়া-মায়া নেই এ কথা সাফ সাফ জানিয়ে দেয় ছেদিলাল। শুধু চামড়াটার জন্য আজ এগারো বছর ধরে ছেদি নওলকিশোরের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছে। তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছে। নওলের খালটার প্রতি অনেক গীধরের দৃষ্টি আছে এটা ছেদীর জানা। মধ্যে কিছুদিন নওল আখাউড়া চেক-পোষ্ট পেরিয়ে ও-পাড় বাংলা ঘুরে এসেছে এ খবরও ছেদিলাল জানে। দামবাবু যেন নিমকহারাম নওলকিশোর মরলে অবশ্যই ছেদিলালকে খবর দেন একথা বলে দামবাবুকে বিদেয় করে।

ছেদীলালের উপর ভরসা হারিয়ে— দমকল-পুলিশ-পুরসভা-মস্তান-স্থানীয় নেতা-অর্থলোভী জন-মজুর এসবের সাহায্যে জনৈক ঠিকেদার-কাম-মাফিয়া-মাস্তানের মাটি-টানা ট্রাক অধিক এবং অন্যায্য মূল্যে ভাড়া করে ধনেপাতা ও বাদামের অতিভোজন-জনিত পীড়ায় কাহিল নওলকিশোরকে আর. কে. নগর ক্যাট্‌ল্ ফার্মের পশু চিকিৎসালয় গোসদনে পাঠাতে পাক্কা কুড়িঘণ্টা সময় লাগে দামবাবুর। অর্থনাশ-পরিশ্রম-টেনশনে কাতর দামবাবু রাত তিনটের সময় বাড়ি ফিরেন সেদিন। ধনেপাতা ও বাদাম চাষের পরিণতিতে এই উটকো ঝামেলা সামাল দিয়ে দামবাবুর শরীরটা ভালো নেই আজ ক'দিন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও আরোগ্য কামনা করি।

এক্সর্ট-কালাশনিকভ-কমাণ্ডো-ব্ল্যাক-ক্যাট এ সব ব্যাপার ত্রিপুর মজুর শ্রেণীর লোকদের কাছেও জলভাত। ইনি কিষন্তর পাল ওরফে 'কমাণ্ডো' দামবাবুর ধনে চাষের উপদেষ্টা ও সহায়ক। আকৃতিতে তাল-ঢ্যাংগা কার্টুন, কর্মকুশল, দক্ষজনমজুর।